

বিএনপি ও
মামুদায়েক
রাজনীতি

আজিজুল ইসলাম ভূঁইয়া





মুক্তিযুদ্ধ



আর্কাইভ

liberationwarbangladesh.org

বিএনপি ও সাম্প্রদায়িক রাজনীতি
আজিজুল ইসলাম ভূঁইয়া

প্রথম প্রকাশ
১ ফেব্রুয়ারি ২০০৭

গ্রন্থস্বত্ব
ডালিয়া জামান চৌধুরী
তাজীন শাদীদ অনিক

প্রচ্ছদ
উত্তম সেন

বর্ণবিন্যাস
আনোয়ার হোসেন
বিবেকানন্দ জয়ধর

সম্পাদনায়
দীপক মুখার্জী

প্রকাশক
শ্রাবণ প্রকাশনী
কক্ষ ২৮ (নিচতলা) ও ১৩২ আজিজ সুপার মার্কেট (২য় তলা)
শাহবাগ, ঢাকা-১০০০। ফোন: ৮৬৫১১৬০

মূল্য : ১২০ টাকা

ISBN: 984-32-2916-26

মুক্তিযুদ্ধ ই-আর্কাইভ ট্রাস্ট
Liberation War eArchive Trust
মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস হোক উন্মুক্ত

উৎসর্গ

আম্প্রদায়িকতার হিংস্র ছোবলে যাদের জীবন
প্রদীপ অকালে নিভে গেছে এবং যারা প্রিয়
মাতৃভূমির মায়া ছেড়ে দেশান্তরিত হয়েছেন সেই
অকল নির্ধাতিত-নিঃহীত মানুষের উদ্দেশে—

নেথকের কথা

এ দেশের আপামর জনগণের অসাম্প্রদায়িক চিন্তাচেতনা ও দীর্ঘ সংগ্রামের ফসল আমাদের প্রিয় মাতৃভূমি বাংলাদেশ। ধর্মের নামে, ইসলামের নামে পাঞ্জাবি শোষকগোষ্ঠী আমাদের দীর্ঘ ২৩ বছর গোলাম বানিয়ে রেখেছিল। ‘আমরা সকলে মুসলমান ভাই ভাই/তোমরা চাও আমরা খাই’ এই স্লোগান দিয়ে বাংলার জনগণকে শোষণের নিগড়ে বন্দি করে রেখেছিল পশ্চিম পাকিস্তানী শাসকচক্র। জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ঐন্দ্রজালিক নেতৃত্বে এ দেশের মানুষ প্রতিবাদমুখর হয়েছে, রুখে দাঁড়িয়েছে সকল প্রকার শোষণ বঞ্চনার বিরুদ্ধে। জাতির জনকের আহ্বানে লড়াকু মানুষ একাত্তরের মহান মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে মাতৃভূমির স্বাধীনতা ছিনিয়ে এনেছে।

একাত্তরের ১৬ ডিসেম্বর ঐতিহাসিক সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে পাকিস্তানী সমরনায়ক জেনারেল নিয়াজীর আত্মসমর্পণের মধ্য দিয়ে কেবল স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের অভ্যুদয়ই হয়নি, এ দেশের মাটি থেকে নির্বাসিত হয়েছিল সাম্প্রদায়িক রাজনীতি ও ধর্মের লেবাসে শোষণ-নির্যাতন। যুদ্ধোত্তর বাংলাদেশে সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠীকে নিশ্চিহ্ন করার বদলে আমরা এক সর্বনাশা সহমর্মিতার রোগে আক্রান্ত হয়ে পড়েছিলাম। আমরা তাদের চিহ্নিত করতে ব্যর্থ হয়েছি অথবা ভুল করেছি। আমাদের এই ভুলের মাশুল চরম মূল্যে শোধ করতে হয়েছে গোটা জাতিকে যখন ’৭১-এর পরাজিত ঘৃণ্য সাম্প্রদায়িকগোষ্ঠী আমাদের হৃৎপিণ্ডের মূলে চরম আঘাত হেনেছে। এর পরই শুরু হয়েছে ইতিহাসের চাকা পেছন দিকে ঘুরিয়ে দেয়ার অশুভ তৎপরতা। শুরু হয়েছিল দেশকে আবার পাকিস্তান বানানোর কূটকৌশল। সাম্প্রদায়িকতার অভিশাপ নেমে এসেছে জাতীয় জীবনে। আবার মরণ-যন্ত্রণা। আবার দেশান্তরি হবার পালা।

পচাত্তরের পটপরিবর্তনের সুফলভোগীরা মদদ দিয়ে মোটাতাজা করেছে স্বাধীনতা বিরোধী রাজাকার, আল-বদরদের। সর্বশেষ তাদেরকে হাত ধরে স্বাধীন বাংলাদেশের

রাষ্ট্রক্ষমতায় অভিসিক্ত করেছে। এই অপকর্মটি অতি সুচারুভাবে সম্পন্ন করেছেন বিএনপি ও তার প্রতিষ্ঠাতা মরহুম জিয়াউর রহমান। আমাদের জাতীয় জীবনের ট্রাজেডি এই যে, স্বাধীনতাবিরোধী সাম্প্রদায়িক শক্তিকে সমাজে ও রাষ্ট্রীয় জীবনে যারা চতুরতার সাথে পুনর্বাসিত ও পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেছে, কোনো কোনো মহল তাদেরকে স্বাধীনতার ঘোষক, স্থপতি ও হোতা বলে এক অলীক ইতিহাস রচনায় লিপ্ত হয়েছে। আমাদের জাতির ইতিহাস থেকে এই মিথ্যাচারের নির্বাসন হওয়া বাঞ্ছনীয়। সত্যের খাতিরেই এই সকল ছদ্মবেশী খলনায়কদের আসল চেহারা জাতির সামনে উন্মোচিত হওয়া দরকার। আমাদের নতুন প্রজন্মের কাছে এই ইতিহাস বিকৃতির বিষয়টি স্পষ্ট করে তুলে ধরার পাশাপাশি মহান মুক্তিযুদ্ধে আমাদের পূর্ব-পুরুষদের বীরত্বগাঁথাকে অবিকৃত অবস্থায় তুলে ধরা উচিত। এই বইখানা সেই লক্ষ্যেরই এক ক্ষুদ্র প্রয়াস।

সূচি

জিয়াউর রহমান চেয়েছিলেন জাতীয় সংগীত ও জাতীয় পতাকা বদলাতে	১১
বিএনপি ও সাম্প্রদায়িক রাজনীতি	১৬
পার্বত্য শান্তিচুক্তি বনাম বিএনপির দেশবিক্রির ধূঁয়া	২১
খালেদা জিয়ার লং মার্চ শান্তি নিয়ে অশান্তি	২৭
ধর্মের নামে বিষবৃক্ষকে লালন করা হচ্ছে: এখনই উৎপাটনের মোক্ষম সময়	৩৩
শহীদ মিনারের অবমাননা দেখে যেন মনে হয় চিনি তাদের	৩৮
চার দলীয় জোট, নিয়াজী তত্ত্ব ও ঢাকার রাজপথে কুশপুত্তলিকা এপিসোড	৪২
প্রশাসনকে বিভক্ত করে সর্বনাশ ডেকে আনবেন না	৪৪
দেশপ্রেমের সোল এজেন্সি!	৪৯
জেনারেল অরোরার মৃত্যু ও শোকপ্রস্তাব বিষয়ক জটিলতা	
জাতির সঙ্গে এ কেমন প্রতারণা?	৫১
যত দোষ নন্দ ঘোষ: জামায়াত-বিএনপি'র ভারত ও আওয়ামী আতঙ্ক	৫৯
অপরের বিবস্ত্র ছবি ছেপে নিজেদের নগ্নতা ঢাকা যায় না	৬৩
পদ তাঁকে ছেড়ে যাওয়ার আগেই তিনি পদত্যাগ করলেন	৬৬
গোলাম আযমের পদত্যাগ না ভিন্নতর কূটকৌশল?	৭১
আমাদের রাজনীতিতে কুড়াল ও গামছা তত্ত্ব	৭৭
পাকিস্তান টিভি'র ধৃষ্টতা ক্ষমার অযোগ্য	৮০
পাকিস্তানের কাছে বাংলাদেশের বর্তমান পাওনা	
এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার কোটি টাকা	৮৩
ব্যর্থ রাষ্ট্র, না ব্যর্থ সরকার	৮৭
ঝিরিনোভস্কির রাজনৈতিক তৎপরবৃত্তি	৯১
নো জাজমেন্টস অ্যাকসেস্টেবল, নো জাজেস সেফ	৯৫
বিএনপি-জামায়াত জোট তোমাকে বধিবে যে গোকূলে বেড়েছে সে	৯৯
রাজাকারের ঔদ্ধত্য পদভরে কম্পিত বাংলাদেশে এবার বৈশাখ	
এসেছে বাঙালিদের অভভেদী দাপট নিয়ে	১০২

জিয়াউর রহমান চেয়েছিলেন জাতীয় সংগীত ও জাতীয় পতাকা বদলাতে

আমাদের সৌভাগ্য হয়েছিল দেশবরেণ্য সাংবাদিক মরহুম আবদুল ওয়াহাবের ছাত্র হওয়ার। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আমরা যখন গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের ছাত্র ছিলাম তখন তিনি আমাদের পড়াতেন। তাঁর সবচেয়ে প্রিয় ছিল ব্যক্তিগত নোটবুক। তিনি বলতেন যার ব্যক্তিগত নোটবুক নেই- সে আদৌ কোন সাংবাদিক হতে পারে না। ওয়াহাব স্যারকে সম্মান করতাম, শ্রদ্ধা করতাম হৃদয়ের অন্তর থেকে। তিনি ছিলেন আমাদের পিতৃতুল্য। কিন্তু স্যারের আবেগ-আকুল কণ্ঠ-ভেজা এই নির্দেশ আমরা অনেকেই পালন করতে ব্যর্থ হয়েছি। ৩৪ বছর নিরবিচ্ছিন্ন সাংবাদিকতার জীবন, অথচ কি অবিশ্বাস্য একটি নোট বুক রাখতে পারিনি। তবে হৃদয়ও একটি নোট বকের মতো। বড় ঘটনা, বড় স্মৃতি, বড় বিস্ময়, হৃদয়ে কেমন করে জানি মোটা হরফে, অনেক সময় নিচে আন্ডারলাইন সহ খোদিত হয়ে যায়, শত চেষ্টা করলেও তা মোছার উপায় নেই, অনেক সময় এই সকল মোটা দাগের স্মৃতি মুছে যাওয়া কিংবা মলিন হয়ে যাওয়ার পরিবর্তে যতই দিন যায় ততই উজ্জ্বলতর হতে থাকে। ততই বাজায় হয়ে ওঠে।

১৯৭৮ সালের ১২ ডিসেম্বর আমার সাংবাদিকতার জীবনে তেমন একটি অবিস্মরণীয় দিন। ভুলতে না পারা স্মৃতিভেজা মুহূর্ত। যতই সময় প্রলম্বিত হবে এ স্মৃতি ক্রমেই আমাকে তাড়িয়ে বেড়াবে। চাবুকপেটা করবে।

এই দিন বন্দর নগরীতে এসেছিলেন প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান, বীর উত্তম। স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম বৃহৎ শিল্প, যা জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের প্রতি শ্রদ্ধার অর্থ্য হিসাবে আমাদের জাতীয় দুঃসময়ের পরীক্ষিত বন্ধু সোভিয়েত ইউনিয়ন তৈরি করে দিয়েছিলেন, সেই জিএম প্লান্টের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধনের জন্য। এমনি এক মহতী অনুষ্ঠান উপলক্ষে এসেও দিনটির শুরু জিয়ার জন্য সুখকর ছিল না। পতেঙ্গা বিমান

কাউকে পদক দ্বারা ভূষিত করতে পারে, সম্মানিত করতে পারে। আবার এমন নজির রয়েছে কোন কারণে কাউকে প্রদত্ত খেতাব আবার কেড়ে নেয়া হয়। আমাদের জাতীয় গর্ব যে আমাদেরকে কারও পদক কেড়ে নিতে হয়নি, অনেকে নিজেদের কর্মকাণ্ডের মধ্য দিয়ে কখনও সখনও ক্ষমতা পাকাপোক্ত করার জন্য কিংবা কুক্ষিগত করার জন্য নিজেদের বিরল সম্মান-খেতাব প্রমুখ নিজেরাই পায়ের নিচে আছড়ে ফেলে দিয়েছে। জাতিকে কিছুই করতে হয়নি।

গর্ব করে আজকে বলা হয় জিয়াউর রহমান সংবিধানে 'বিসমিল্লাহ' সংযোজন করেছে। এতে কিন্তু কিছুতেই এটা বোঝার অবকাশ নেই যে সংবিধানে বিসমিল্লাহ সংযোজিত হওয়ার পূর্বে এদেশের কোন মমিন মুসলমানের মুখে বিসমিল্লাহ ধ্বনিটি শ্রুত হয়নি। অথবা একথাও মনে করার কারণ নেই যে সংবিধানে বিসমিল্লাহ সংযোজনের সাথে সাথে এই ধ্বনিটি উচ্চারণ করা গোটা দেশে ইসলামী সংস্কৃতির এক অনবদ্য ও অতুজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হয়ে উঠেছে। আমরা ঘর পোড়া গরু, সিদুর মেঘ দেখলেই ভয় পাই। আমরা জানি ধর্ম অতি পবিত্র, অতি সুন্দর। ধর্ম মানুষকে সৎ, বিনয়ী, সাহসী ও দেশ প্রেমিক হতে শেখায়; আবার আমরা এটাও দেখেছি ধর্ম যখন রাজনীতির স্বার্থে কিংবা ধর্ম ব্যবসায়ীদের হাতে পড়ে তখন কি প্রকটভাবে ধর্মের অপব্যবহার হয়, ধর্ম কলুষিত হয়। এই ধর্মের নাম দিয়েই পাঞ্জাবী শাসক গোষ্ঠী ২৩ বছর বাঙালিদের নির্মম শোষণ-বঞ্চনার শিকারে পরিণত করেছিল। এই ধর্মের নামেই ২৫শে মার্চ নীরিহ বাঙালিদের উপর পাকিস্তানী পশু শক্তির গণহত্যা চালিয়েছিল, ইসলাম রক্ষার নামেই আমাদের দু'লক্ষ মা-বোনদের রজনীগন্ধার মতো পবিত্রতা তছনছ করা হয়েছিল এবং জাতির জনক বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করার পর একই ধর্মব্যবসায়ীরা সংবিধানে বিসমিল্লাহ সংযোজনসহ হরেক রকম কাজ করেছিল। এর সাথে পবিত্র ধর্ম ইসলামের কোন উন্নতি কিংবা অবনতির প্রশ্ন জড়িত ছিল না। শুধুই জড়িত ছিল সুবিধাবাদী ধর্ম-ব্যবসায়ীদের ক্ষমতা দখল ও ক্ষমতাকে কুক্ষিগত করার কৌশলটি।

মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ নিয়ে কিছু কথা রয়েছে। এমন একটি ধারণা প্রচলিত আছে যে, কেউ কেউ মুক্তিযুদ্ধে গিয়েছে তবে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা হৃদয়ে ধারণ করতে পারেনি। আবার কেউ মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ধারণ করতে পারেনি বটে তবে মুক্তিযুদ্ধে গিয়েছে স্রেফ এক চতুর বাণিজ্যের অভিযাত্রী হয়ে। আমাদের অনেক মুক্তিযোদ্ধা ও তথাকথিত মুক্তিযুদ্ধের ঘোষণার দাবিদারদের বেলায়ও একথা অক্ষরে অক্ষরে প্রযোজ্য।

বিএনপি ও সাম্প্রদায়িক রাজনীতি

সম্প্রতি গণঅভ্যুত্থানের মুখে পতিত প্রধানমন্ত্রী ও বিএনপি'র চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়া ১৬ এপ্রিল মানিক মিয়া এভিনিউর জনসভায় দাঁড়িয়ে বলেছেন, 'এক শ্রেণীর লোক বাংলাদেশে বাস করে, বাংলাদেশে খায় কিন্তু টাকা জমায় অন্য দেশে। এদেরকে চিহ্নিত করতে হবে। এরা থাকলে দেশের উন্নয়ন হবে না'

বিএনপি নেত্রীর বক্তব্যের অন্তর্নিহিত মেসেজটি একেবারেই পরিষ্কার। খোলামেলা। কোন নাম না বললেও এক শ্রেণীর লোক বলতে তিনি বাংলাদেশের বংশপরম্পরায় নাগরিক হিন্দু সম্প্রদায়ের কথা বুঝিয়েছেন এবং টাকা জমানোর 'অন্য দেশটি' বলতে বুঝিয়েছেন ভারতকে।

বেগম জিয়ার অভিযোগটি কিন্তু খুবই গুরুতর। অন্য দেশে টাকা পাচার করা জঘন্য অপরাধ। কোন কোন দেশের আইন অনুযায়ী টাকা পাচার মৃত্যুদণ্ডযোগ্য অপরাধ। গণরোষে ক্ষমতাচ্যুতির পূর্বে বেগম জিয়া প্রায় পাঁচ বছর ক্ষমতায় আসীন ছিলেন তাই কারা অর্থ পাচারকারী এ তথ্য নিশ্চয়ই তার জানা। অতএব সবিনয় প্রশ্ন করতে ইচ্ছে করে, ম্যাডাম অর্থ পাচারকারী ঐ সব দেশদ্রোহীদের বিরুদ্ধে সরকার প্রধান হিসেবে আপনি কি কি শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন। নাকি টাকা পাচারের ঘটনাটি কেবল আপনি ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার পরপরই জানতে পারলেন?

আমরা জানি নির্বাচনের মওসুম আসলেই বিভিন্ন দল হরেক রকমের কূট-কৌশল ও ছলাকলার আশ্রয় নেয়। আবহমানকাল ধরে বাংলার মানুষ চিন্তায়-চেতনায় অসাম্প্রদায়িক। তবুও নির্বাচন আসলে সংখ্যালঘু সম্প্রদায় নানা রকমের অপপ্রচারের শিকার হন। কিন্তু খালেদা জিয়া মানিক মিয়া এভিনিউতে যে বক্তব্য রেখেছেন তাকে শুধু নির্বাচনী ছলচাতুরী বলে চালিয়ে দেয়ার অবকাশ নেই। তার বক্তব্যের মধ্য দিয়ে তিনি কোটি কোটি মানুষের অটল দেশপ্রেমের প্রতি কটাক্ষ করেছেন। তাদের চিহ্নিত করার কথা বলে সুখে-শান্তিতে-স্বস্তিতে জীবনযাপন করার মৌলিক অধিকারের ওপর

সংখ্যালঘুদের মর্মপীড়ার কারণ। দেশের নাম পাল্টালেও সংখ্যালঘুদের প্রতি শাসকদের চিন্তা-চেতনার তেমন কোন তফাত ঘটেনি, কেবল স্বাধীনতা-উত্তর সাড়ে তিন বছর বাদে।

খালেদা জিয়ার ভাষণে প্রকাশিত ও প্রতিধ্বনিত হিন্দুদের দেশপ্রেমের প্রতি কটাক্ষ, তাদের চিহ্নিতকরণের ও দেশান্তর করার চিন্তাচেতনা সেই পাক শাসকদের কথাই মনে করিয়ে দেয়। এই দুই সম্প্রদায়ের শাসকদের হিন্দু বিদ্বেষের কারণটিও একই সূক্ষ্ম সমীকরণের সুতোয় বাঁধা। পাক শাসকদের হিন্দু বিদ্বেষের কারণ তৎকালীন পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যকার সংখ্যাগুরু ও সংখ্যালঘুর প্রশ্নটি। হিন্দুদের তাড়াতে পারলেই বাঙালিদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা খর্ব করা যাবে তাই নানা ফন্দি ফিকির করা হতো হিন্দুদের বিতাড়িত করতে। ঠিক তেমনিভাবে আজকের পাকিস্তানী ঢঙের শাসকরা নির্বাচনের প্রশ্নে হিন্দুদের বৈরী বলে মনে করেন এবং হিন্দুদের তাড়াতে পারলেই নির্বাচনে কিস্তিমাত করা যাবে- এমন একটি কুটিল মানসিকতা তাদেরকে তাড়িয়ে বেড়ায়। ফলে নির্বাচন আসলেই তারা শুরু করে হিন্দু সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে বিষোদগার। এ পর্যন্ত খুব কমই ভোট হয়েছে যেখানে হিন্দু ভোটারগণ নিরুপদ্রবভাবে তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পেরেছে। একটি সম্প্রদায় বৈরী পরিবেশে অনন্তকাল কোন স্থানে টিকে থাকতে পারে না। খালেদা জিয়া না চাইতেই বহু পূর্ব থেকে হিন্দু সম্প্রদায়ের অনেকেই এদেশ থেকে নিরুদ্দেশ হয়ে যাচ্ছে। এসোসিয়েশন ফর ল্যান্ড রিফর্ম এন্ড ল্যান্ড ডেভেলপমেন্ট, বাংলাদেশ-এর এক তথ্যে দেখা গেছে, ১৯৬৫ সালের পর থেকে এ পর্যন্ত ৫৩ লাখ হিন্দু নাগরিক এদেশ থেকে নিরুদ্দেশ হয়েছে। প্রতিদিন গড়ে দেশত্যাগীদের সংখ্যা ৫৩৮ জন।

কিন্তু সবচেয়ে মজার বিষয়টি হলো বিএনপি ক্ষমতাসীন হবার পর থেকেই তার কর্মকাণ্ড ও চিন্তা-চেতনায় দু'টি পরস্পর বৈপরীত্য স্রোতের ধারা পরিলক্ষিত হয়েছে। ক্ষমতা পাকাপোক্ত করার জন্য, সিংহাসনকে নিষ্কটক করার জন্য বিএনপি এক নগ্ন ও সর্বনাশা নতজানু নীতি অবলম্বন করে ভারতকে তোষামোদ ও খোশামোদ করার জন্য বাংলাদেশের বাজার ভারতের জন্য উন্মুক্ত করে দেয়। বৈধ ও অবৈধ পথে ভারতের পণ্য দেশে প্রবেশ করতে দিয়ে এদেশের শিল্প ও কৃষিজ পণ্যের উৎকর্ষের সম্ভাবনা চিরতরে রুদ্ধ করে দিয়েছে, আর যুগপৎ সহজ সরল ধর্মপ্রাণ মানুষকে ধোঁকা দিয়ে বোকা বানানোর জন্য মুখে চালিয়েছে তীব্র ভারত ও হিন্দুবিরোধী বিদ্বেষ, ঘৃণা।

জাতিসংঘের ফ্লোরে দাঁড়িয়ে বেগম জিয়া ফারাক্কা প্রশ্নের গরম বক্তৃতা করে রাতারাতি ভারতবিরোধী হিরোইন হিসেবে নিজেকে দেশের মানুষের কাছে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন। অথচ রাষ্ট্রীয় সফরে দিল্লি গিয়ে নরসিমা রাওয়ের সাথে যুক্ত ইশতেহারে দাসখত লিখে দিয়ে ফেরার পথে তিনি বিমান বন্দরে সাংবাদিকদের প্রশ্নোত্তরে

বলেছিলেন, ‘সরি, ফারাক্কার ব্যাপারটা বেমালুম ভুলেই গিয়েছিলাম।’ আসলে ভুলে তিনি যাননি। ওটা তুললে পাছে নরসিমা রাও অখুশী হন তাই কেবল ভোলার ভান করেছেন ম্যাডাম। শুধু তাই নয় কেবল ভারতীয় প্রতিপক্ষকে খুশি করার জন্যে যুক্ত ইশতেহারে তিনি এমন দাসখত লিখে এসেছেন যার পথ বেয়ে “‘পুশ ইন’ ‘পুশ-ব্যাক’ “অভিযান চালায় দিল্লি সরকার। এখানে উল্লেখ্য যে, খালেদা জিয়া ও নরসিমা রাওয়ের মধ্যে স্বাক্ষরিত যুক্ত ইশতেহারে পরিষ্কারভাবে বলা আছে, “Both sides agree that there is heavy influx of illegal citizens from the both countries and we agree to take back all such illegal citizens if found in the respective countries.” এখানে লক্ষ্য করার বিষয় যেহেতু খালেদা জিয়া যুক্ত ইশতেহারে কোন সময়সীমা উল্লেখ করেনি অতএব ভারত তার ভূ-খণ্ডে বসবাসকারী বাংলাদেশ থেকে তথা পূর্ব পাকিস্তান থেকেও যারা অবৈধভাবে সেদেশে গমন করেছে তাদেরকে স্বাক্ষরিত এই যুক্ত ইশতেহারের বলে বাংলাদেশে ন্যায়সঙ্গতভাবে ফেরত পাঠাতে পারে। রাষ্ট্রনায়ককে তথা সরকার প্রধানকে শিক্ষিত হতে হয়। শিক্ষাগত সার্টিফিকেট না থাকলেও তাঁকে অর্জন করতে হয় প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য। রাষ্ট্রাচার ও কূটনীতির জটিল কলাকৌশল তাঁর আয়ত্বে থাকতে হয়। তা নাহলে জাতিকে, দেশকে ও দেশের মানুষকে দিতে হয় চরম মূল্য। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর ভারতের সাথে বাংলাদেশের মৈত্রী চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। তাতে স্বাক্ষর দেন বাংলাদেশের পক্ষে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু ও ভারতের পক্ষে পণ্ডিত জওহর লাল নেহেরুর তনয়া সমসাময়িক বিশ্বের বিদগ্ধ রাষ্ট্রনায়ক শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধী। সেই চুক্তির খসড়ায় ভারতের বাঘা বাঘা আমলারা একই কায়দায় এই অবৈধ নাগরিকদের ফেরত নেয়ার বিষয়টি সন্নিবেশিত করেছিল। বঙ্গবন্ধু শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধীর হাত ধরে বলেছিলেন, “Madam, don’t try to push such a big bundle which my small neck can’t bear. I must take back those Bengalis who crossed over to India only after the dreadful night of March 25, 1971.” ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের বিশাল বিশাল কর্তা ব্যক্তির বঙ্গবন্ধুর এহেন ‘উদ্ধত’ ও ‘সাহসী’ আচরণে স্তম্ভিত হয়েছিলেন। তবে শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধী সহাস্যে বলেছিলেন, “Yes, it will be so.” এবং মুজিব-ইন্দিরা চুক্তিতে এভাবেই বলা হয়েছিল ১৯৭১ সালে ২৫ মার্চের পর বাংলাদেশ থেকে যেসকল নাগরিক ভারতে চলে গেছেন বাংলাদেশ সরকার তাদের ফেরত নেবেন।

খালেদা জিয়া পাঁচ বছর নিরুপদ্রব রাজত্ব করলেন ভারতের সাথে সম্পাদিত ২৫ বছরের ‘মৈত্রী চুক্তি’র জোরে আর ক্ষমত্যাচ্যুতির পরেই হুঙ্কার ছাড়লেন ‘গোলামি চুক্তি’র বিরুদ্ধে। সম্প্রতি গণআন্দোলনে ধরাশায়ী হওয়ার পর বিএনপি পুনরায় ক্ষমতা দখলের জন্য মরিয়া হয়ে উঠেছে। বেগম জিয়া তো প্রকাশ্যেই ঘোষণা দিয়েছে, ‘আগামী নির্বাচনে বিএনপিকে ক্ষমতায় যেতেই হবে। অতএব তাদের ক্ষমতা দখলের মোক্ষম

অস্ত্র ভারত ও হিন্দু বিদেশ প্রচারণার মাত্রাও বাড়িয়ে দেয়া হয়েছে একই হারে। তবে সেই মাত্রা বাড়াতে গিয়ে সর্দি-কাশির রোগীকে যক্ষ্মা রোগী বানানোর মতো বিকারগ্রস্ত হয়ে পড়েছে বিএনপি'র নেতৃত্ব।

গত মাসের প্রথম সপ্তাহে নারায়ণগঞ্জে এক জনসভায় ভাষণ দিতে গিয়ে বিএনপি'র এক সাবেক মন্ত্রী বলেছেন, বিরোধীদের অসহযোগ আন্দোলন আসলে একটি ভারতীয় ষড়যন্ত্র। তিনি তার বক্তব্যের প্রমাণ দিতে গিয়ে বলেছেন, এই অসহযোগ চলাকালীন সময়ে চট্টগ্রাম বন্দর থেকে ৩০ হাজার কোটি টাকার পণ্য বিভিন্ন ভারতীয় বন্দরে ডাইভার্ট হয়ে গেছে। সত্যিই বটে! বাংলাদেশের মোট বার্ষিক আমদানি পণ্যের পরিমাণ ২১ থেকে ২২ হাজার কোটি টাকা। এর প্রায় এক-চতুর্থাংশ আমদানি হয় ভারত থেকে। বাকি ১৫/১৬ হাজার কোটি টাকার পণ্যের কিছু আসে বিমান কার্গোতে, কিছু চালনা বন্দর দিয়ে, বাকিটা আসে চট্টগ্রাম পোর্ট দিয়ে। কিন্তু বিএনপি নেতার আবিষ্কার অনুযায়ী ২০ দিনের অসহযোগের সময়ই নাকি ৩০ হাজার কোটি টাকার আমদানি পণ্য চট্টগ্রাম বন্দর থেকে ভারতীয় বন্দরে চলে গেছে। মন্ত্রী মহোদয় পণ্ডিতই বটে।

বিএনপি'র ধরাশায়ী মন্ত্রী তরিকুল ইসলাম গত ১০ এপ্রিল যশোরে এক জনসভায় বলেছেন, ২০ দিনের অসহযোগে দেশের ৭৫ হাজার কোটি টাকার সম্পদ নষ্ট হয়ে গেছে। (তথ্য-বাসস)। অথচ দেশের মোট জিডিপি'র পরিমাণ মাত্র ১২৫ হাজার কোটি টাকার মতো।

ঘর পুড়িয়ে খই খাওয়া যায় বটে। তবে নেহাত বেকুব ছাড়া কেউ নিজের ঘরে আগুন দেয় না। কারণ আগুনে দু'চারটা খই হয়তো ফুটেতে পারে কিন্তু ঘরটাও হারখার হয়ে যায়। আজ হিন্দু সম্প্রদায়ের দেশপ্রেমের ওপর কটাক্ষ করে তাদের চিহ্নিত করে কিংবা তাদের দেশান্তর করে নির্বাচন মৌসুমে খই খাওয়ার মজা হয়তো পাওয়া যাবে। কিন্তু কালে নিজেদের ঘর পুড়বে না এই গ্যারান্টি কে দেবে? দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব সুরক্ষা, জাতীয় অগ্রগতি ও সমৃদ্ধি নিশ্চিতকরণের স্বার্থে বাংলাদেশে একটি মালটি-রিলিজিয়াস সমাজের বিকাশ অপরিহার্য। মনে রাখতে হবে, নির্বাচন জেতার চেয়ে অনেক বড় দেশ ও জাতির স্বার্থ। ছলচাতুরি কিংবা আত্ম-প্রতারণার গিলাব চড়িয়ে কোন জাতিকেই বড় করা যায় না। অতএব যাদের মনে বিন্দুমাত্র দেশপ্রেম ক্রিয়াশীল তাদের উচিত চাতুরির কাফন দিয়ে যেন আবহমান বাংলার অসাম্প্রদায়িক চিন্তাচেতনাকে ও মননশীলতাকে দাফন করে দেশ ও জাতির সর্বনাশ ডেকে না আনেন।

পার্বত্য শান্তিচুক্তি বনাম বিএনপির দেশবিক্রির ধুঁয়া

‘গোপন চুক্তির’ মাধ্যমে বাংলাদেশকে ভারতের কাছে বিক্রি করে দেয়া হয়েছে- বলেছেন বিএনপির চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়া। বরিশালের জনসভায়। ইতিপূর্বে ঢাকায় সাংবাদিকদের ডেকে বিএনপির মহাসচিব মান্নান ভূঁইয়া বলেছেন, “চুক্তি কি হয়েছে জানি না- তবে অসম চুক্তি হয়েছে। এই চুক্তির ফলে স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব বিকিয়ে দেয়া হয়েছে। আমরা চুক্তি মানবো না, মানি না।”

চুক্তি কি হয়েছে তা না জানলেও এটি যে অসম চুক্তি তা জানলে কিভাবে হে বাপু। এত সহজ সমীকরণটুকুও ভাবলেন না, এতবড় একটি উক্তি করার আগে! চিলে কান নিয়ে গেছে, অতএব হটাৎ চিল। গুলিবিদ্ধ করো তাকে। মারো চিল, মারো চিল।

না ম্যাডাম, আপনি একটু হাত দিয়ে পরখ করলেই দেখবেন চিলে আপনার কানও নেয়নি। কানপাশাও নয়। আপনার জ্বলজ্বলে মুক্তোর কানফুল সঠিক স্থানেই রয়েছে। তাহলে আপনি ক্ষেপেছেন কেন? গিরিকুন্তলা পার্বত্য অঞ্চলে শান্তির ফল্লুধারার প্রবাহ নিশ্চিত হচ্ছে শুনে আপনার অন্তরে অশান্তির আগুন এমন দাউ দাউ করে জ্বলে উঠল কেন? দীর্ঘ দু’দশক ধরে পাহাড়ী মানুষ শান্তির ললিতবাণী শোনার প্রত্যাশায় অপেক্ষমাণ উদগ্রীব। তাঁদের দ্বার প্রান্তে যখন সুবহ-সাদেকের উদ্ভাসিত সূর্যকিরণের মত শান্তির সুবর্ণ-রেখা দৃশ্যমান তখন আপনাদের অন্তরের গহীনে রক্তক্ষরণের পালা শুরু হল কেন?

পাকিস্তান আমলে কথায় কথায় বলা হত ইসলাম বিপন্ন। ইসলাম গেল, ইসলাম গেল। আর বর্তমানে একই সুরে পাকিস্তানিদের এদেশীয় চররা কথায় কথায় বলছে দেশ ভারতের কাছে বিক্রি হয়ে গেছে। খালেদা জিয়া যেভাবে বলে বেড়াচ্ছে পার্বত্য চট্টগ্রামের শান্তি চুক্তির মাধ্যমে সরকার বাংলাদেশকে ভারতের কাছে বিক্রি করে দিয়েছে তাতে স্বাভাবিকভাবেই মনে হওয়ার কথা এই চুক্তির খসড়া খালেদা জিয়ার কাছে আছে। যদি তাই হয় ম্যাডাম দয়া করে চুক্তিটি প্রকাশ করে জনগণকে বলে দিন চুক্তির কোন

রাজ্য জয় করা যায়, গোপনে সহ-যোদ্ধা ও সহ-পেশার বন্ধুদের কিভাবে ফাঁসিতে লটকিয়ে নিজের গদি পাকা পোক্ত করা যায়, কিভাবে গোপনে বসে দল বানানো যায়- কিভাবে অন্যের দল ভাঙানো যায় এসব ব্যাপারে বিশ্বকর্মা হলেন বিএনপির নেতৃত্ব। যাদের দলের জন্ম গোপনে, যাদের দলনেত্রীর জন্ম তারিখেও গোপনীয়তায় ভরা, তারা অন্যের সকল কাজের মধ্যে ‘গোপন’ ‘গোপন’ গন্ধ পাবে এটাইতো স্বাভাবিক। তবে তাদের একথা বোঝা উচিত যে জাতির কাছে তাদের কোন গোপন কাজই গোপনে থাকে না। এমনকি একান্তরের অগ্নিব্রূড়া দশমাস জাতি যখন স্বাধীনতার লড়াইয়ে মত্ত তখন বর্তমান বিএনপি নেত্রী গোপনে দশ মাস কোথায় কিভাবে কাদেরকে নিয়ে কাটিয়েছেন দেশের মানুষ তাও জেনে ফেলেছেন। জাতির কাছে সে গোপন কেছা ‘ওপেন সিক্রেট’। এমনকি সম্প্রতি জাতি যখন স্বাধীনতার রজতজয়ন্তী উৎসব পালনের মধ্য দিয়ে নতুন করে দেশ গড়ার শপথ নিয়ে আগুয়ান তখনও বেগম জিয়া গোপনে পাকিস্তানে বসে পুরাতন বন্ধুদের সাথে কি গোপন শলাপরামর্শ করেছেন সেটি তাঁর দেশে ফেরার আগে ‘সিসেম ফাঁক’ হয়ে গেছে। বেগম জিয়া দেশে ফেরার আগেই মানুষ তার বুকের ভিতরের গোপন কাহিনী পত্রিকার মাধ্যমে জেনে ফেলেছেন।

আওয়ামী লীগ-যার জন্ম হয়েছে বাংলাদেশের মানুষের মুক্তির লক্ষ্যে, যার নেতা প্রধানমন্ত্রীত্বের পদে লাখি মেরে জনগণের অধিকার শ্রেয় বলে ঘোষণা করেছিলেন, যিনি জীবনের গোটা যৌবন কারাগারে কাটিয়েছিলেন মানুষের মুক্তির লক্ষ্যে, যিনি হাজার মাইল দূরে জেল প্রকোষ্ঠে বসেও মুক্তিযুদ্ধের নেতৃত্ব দিয়েছেন সেই আওয়ামী লীগ দেশকে বিক্রি করবে ভারতের কাছে- আর দেশের স্বাধীনতা রক্ষা করবে খালেদা জিয়া ও তার লক্ষ সাথী পাক সেনাদের মুরগি সরবরাহদাতা, রাজাকার পদধারী কুখ্যাত সাম্প্রদায়িক রাজনীতির সফল ব্যবসায়ী ও সামান্য লোভের বশবর্তী হয়ে বাংলার মজলুম নেতা মাওলানা ভাসানীর পার্টির সাইনবোর্ড বিক্রি করে স্বৈরতন্ত্রের পদলেহী কুলাঙ্গারবৃন্দ! মায়ের চেয়ে যেন মাসির দরদ বেশী। আসলে মাসী নয় এরা ডাইনী। দেশ ও জাতির ঘাড়ে সত্যিই আজ ডাইনী সওয়ার হয়েছে। সর্বশেষ খালেদা জিয়া চাঁটগাতে ঘোষণা করেছেন; যেদিন শান্তিচুক্তি স্বাক্ষর হবে সেদিনই দেশব্যাপি হরতাল ডাকা হবে। কি সাংঘাতিক দেশপ্রেম বিবর্জিত ঘোষণা। উক্তিটি যদি এমন হতো, শান্তি চুক্তির কোন ধারায় যদি দেশ ও জাতির স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের বিরুদ্ধে কিছু সন্নিবেশিত করা হয়, তাহলে আমরা মানবো না এবং হরতাল করবো, তাহলেও মেনে নেয়া যেত।

আজ বিশ্বজুড়ে মানুষ যেখানে কেবল মানুষের মতো মানুষ হয়ে বেঁচে থাকতে বিভেদের দেয়াল উপড়ে ফেলছে, দেশের সীমান্ত তুলে দিচ্ছে আর দেশের মুদ্রাও করে ফেলেছে

এক ও অভিন্ন এমনি একটি মানব জাতির ঐক্যবদ্ধ মহা মিছিলের মহেন্দ্রক্ষণে কোন এক দেশের কোন এক দলের নেত্রী ঘোষণা দেবে, শান্তি চুক্তি মানি না-যুদ্ধ অশান্তি টিকিয়ে রাখতে হবে। সংঘর্ষ সংঘাত চলবে। তখন এটা বিশ্বাস করতে কষ্ট হয়। সরকারের সুস্পষ্ট ঘোষণা সত্ত্বেও পার্বত্য অঞ্চল থেকে সেনাবাহিনী প্রত্যাহার করা হবে-বাঙালিদের পাহাড় থেকে বহিষ্কার করা হবে এ ধরনের মিথ্যা, অলীক ও প্রতারণাপূর্ণ মিথ্যাচার ছড়িয়ে জাতিকে হয়তো বিস্মিত করা যাবে কিন্তু কিছুতেই তাদের বিভ্রান্ত করা যাবে না। কারণ জাতি অনেক মিথ্যাচার মোকাবেলা করে '৯৭-এর শেষ প্রান্তে এসে দাঁড়িয়েছে।

আজ তাই প্রকাশ্যেই বোঝা যাচ্ছে জাতির ঘরে ডাইনী ভর করেছে। ছোটবেলায় দেখেছি কারো কাঁধে ডাইনী কিংবা ভূত-প্রেত ভর করলে তান্ত্রিক ডাকা হত ডাইনী ছাড়ানোর জন্য। সেই তন্ত্রী-যন্ত্রীরা এসে প্রথমেই লাইট নিভিয়ে অন্ধকার করে দিত বৈঠক জায়গাটি। তারপরে ধূপ-ধূনা দিয়ে শুরু হত বেদম পিটুনি। ঘরের আঙিনা ও পরিষ্কার করার ঝাড়ুটি দিতে হত তান্ত্রিক সাধু বাবাকে। যতবড় ঝাড়ু, যত বেশি পেটানো তত তাড়াতাড়ি হ'তো ডাইনী বিদায়। আজ জাতির ঘরে যে ডাইনী ভর করেছে তা থেকে জাতিকে পরিত্রাণ দিতে হলে সেই ঝাড়ু পেটানো শুরু করা দরকার। এটা যত দ্রুত করা যাবে জাতির জন্য ততই মঙ্গলময় হবে।

খালেদা জিয়ার লং মার্চ : শান্তি নিয়ে অশান্তি

নয় জুনের লং মার্চ নিয়ে দেশে আবার সংঘাতময় পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। বিএনপি চেষ্টা করছে তাদের বহু কাক্ষিত ও প্রয়োজনীয় ইস্যু সৃষ্টির জন্য লংমার্চকে ব্যবহার করতে। অন্যদিকে আওয়ামী লীগও তাদের রাজনৈতিক অস্তিত্ব বজায় ও সরকারের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠায় ঐ দিন রাজপথ দখলের কথা ঘোষণা করেছে। অবস্থা যাই হোক একটি প্রচণ্ড ঝড়ের আশংকায় দেশের মানুষ উৎকণ্ঠিত। কখন কার লাশ পড়বে, কার মার কোল খালি হবে কেউ বলতে পারে না। কিন্তু সেদিকে সংশ্লিষ্ট রাজনৈতিক দলের কোন মাথাব্যথা আছে বলে মনে হয় না- তাদের কেবল চাই ইস্যু, লাশ এবং লাশের মিছিলে ভর করে ক্ষমতার মসনদ দখল।

আসলে জুনের লং মার্চ কি এবং কেন? এটা কি দেশ ও জাতির জন্য খুবই প্রয়োজনীয় এবং অপরিহার্য। দুই দশকের বেশি সময় ধরে পার্বত্যগিরি প্রান্তরে যে অশান্তির আগুন জ্বলছিল তা যখন স্তিমিত হয়ে শান্তির সুবর্ণ রেখা উঁকি-ঝুঁকি দিতে শুরু করেছিল তখন গোটা দেশ জুড়ে অশান্তির আগুন জ্বালানোর এই সর্বনাশা আত্মহননের পথ বিএনপি বেছে নিল কেন? পার্বত্য শান্তিচুক্তি ও পার্বত্য বিলসমূহের বিরুদ্ধে বিএনপির কি সত্যিই বিশেষ কিছু বলার ছিল?

আমরা সকলেই জানি পাহাড়ি জংলী ফুল। ওদের সৌন্দর্য অবলোকন করতে হবে অনেক দূর থেকে। ওদের গায়ের সুঘ্রাণে পেতে হবে মৃদুমন্দ সমীরণ স্পর্শ করে। ওদের ছুঁতে নেই- পাপড়ি ঝরে যাবে।

আমাদের ইতিহাস, ঐতিহ্য সাংস্কৃতিক অহংকার পার্বত্য চট্টগ্রাম ও তার নিষ্কলুষ জনপদের কথা বলতে গেলে উপরোক্ত ঐতিহাসিক উপলব্ধিটুকু মনে রেখেই এগুতে হবে। অন্যথায় সবকিছু ভুল হয়ে যাবে। ভুল হয়ে যাবে।

বিএনপি চেয়ারপার্সন বেগম খালেদা জিয়া পার্বত্য শান্তিচুক্তি ও আইন বাতিলের দাবিতে

নয় জুন লং মার্চ ঘোষণা দিয়েছেন। ঘোষণা দিয়েছেন ঐতিহাসিক পল্টন ময়দান থেকে। কিন্তু ঐতিহাসিক বাস্তবতার দিকে তিনি তাকাতে ব্যর্থ হয়েছেন। ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ সরকার যখন পার্বত্য শান্তি প্রক্রিয়া শুরু করে তখন থেকেই বিএনপি তার ঘোর বিরোধিতা করে আসছে। দেশ বিক্রি, ফেনী পর্যন্ত ভারতের অধিকারে চলে যাওয়া, স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব বিপন্ন কিংবা সংবিধানের লঙ্ঘন প্রভৃতি যে সকল গুরুতর অভিযোগ বিএনপি এ পর্যন্ত জাতির নিকট উত্থাপিত করেছে তার সকল রহস্য ও অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য সম্পূর্ণভাবে ধরা পড়েছে বিএনপির সংসদ বর্জন, পল্টনে অনশন এবং সর্বোপরি লংমার্চের কর্মসূচির ঘোষণার মধ্য দিয়ে।

পার্বত্য চট্টগ্রামের সমস্যা সমাধানে কেবল আওয়ামী লীগই উদ্যোগ নিয়েছে এমনটিতো নয়। বরং বিগত বিএনপি সরকার যেখানে এসে থেমেছে আওয়ামী লীগ সরকার শুরু করেছে সেখান থেকেই। কর্নেল (অব.) অলি আহমেদ বীর বিক্রমের নেতৃত্বে বিএনপি একটি সংসদীয় কমিটি গঠন করেছিল পার্বত্য চট্টগ্রামের সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে। আওয়ামী লীগের দুজন সাংসদও ছিলেন সে কমিটির সদস্য। তারা আন্তরিকভাবে চেষ্টা করেছেন অলি কমিটির সাথে। তারা কষ্ট করে অলি কমিটির ৭টি সভায় যোগদিতে গিয়েছেন সীমান্তের অপর পারে- ত্রিপুরায়।

মূলত দুটি প্রধান কারণে অলি কমিটি ব্যর্থ হয়েছেন চুক্তিতে পৌঁছাতে। এক. বিএনপির প্রতি পার্বত্য জনগণের অবিশ্বাস ও আস্থাহীনতা। দুই. সমস্যা সমাধানে বিএনপির ভুল কৌশল। বিএনপি'র প্রতি পার্বত্য জনগণের অবিশ্বাস ও অনাস্থা একবারেই স্বাভাবিক ও সঠিক। বিএনপির প্রতিষ্ঠাতা লোকায়ত রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান চট্টগ্রাম সার্কিট হাউজে এক নীতি নির্ধারণী সভায় স্পষ্টতই ঘোষণা দিয়েছিলেন "The only solution of Chittagong Hill Tracts problem is to bring a drastic change in the composition of the population of the hill areas" জেনারেল জিয়ার একথা শুধু ঘোষণার মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না। এই ঘোষণার বাস্তবায়ন এর ফলশ্রুতিতে হাজার হাজার পাহাড়ি নির্দোষ মানুষকে আবহমানকালের প্রিয় বাসভিটা ত্যাগ করে দেশান্তর হতে হয়েছে। হিংস্র অরণ্যানী ও শাপদসংকুল পাহাড়ে বসবাসকারী প্রকৃতির মতোই নির্মল, নির্লোভ ও নির্দোষ বলেই পাহাড়ি মানুষগুলোকে এহেন বিড়ম্বিত ভাগ্য মেনে নিতে হয়েছিল। পাহাড়ি মানুষের স্মৃতিতে যতদিন সেই বিভৎস দৃশ্য সজীব থাকবে, জীবন্ত থাকবে বিএনপির প্রতি তাদের সন্দেহ ও অবিশ্বাস ততো দিন দূর হবে না।

দ্বিতীয়ত অলি কমিটি তথা বিএনপির কৌশলটি ছিল সম্পূর্ণ ভুল। বিএনপির বিশ্বাস পার্বত্য চট্টগ্রামের সমস্যার সমাধান করতে হবে Language of weapeans দ্বারা। অবশ্য অস্ত্রের ভাষা বিএনপির কাছে গ্রহণযোগ্য বলে মনে হতে পারে। বিএনপির জন্মবৃত্তান্তই এই সত্যকে প্রমাণ করে। কিন্তু পার্বত্য চট্টগ্রামের সমস্যা সমাধানে অস্ত্রের

ভাষা নয়। সমাধান Sweet Words-এর মধ্যে নিহিত। এই সত্যটি উপলব্ধি করতে বিএনপি ব্যর্থ হয়েছে বিধায় সমস্যা থেকে গেছে। সমাধান হয়নি। অলি কমিটিতে আওয়ামী লীগের দুজন সাংসদ ছিলেন সদস্য হিসাবে। তাঁরা প্রতিটি সভায় অংশগ্রহণ করেছেন। এমনকি আওয়ামী লীগসহ সকল বিরোধী দল সংসদ থেকে একযোগে পদত্যাগ করার পরও আওয়ামী লীগ সাংসদগণ পার্বত্য চট্টগ্রাম-বিষয়ক অলি কমিটির সভায় যোগ দিয়েছেন এবং সভাগুলোতে সবসময়ই শেখ হাসিনার বিঘোষিত নীতি “পার্বত্য চট্টগ্রামের সমস্যা রাজনৈতিক এবং রাজনৈতিক ভাবেই এর সমাধান হতে হবে” এই বক্তব্যটিকে সঠিকভাবে তুলে ধরেছেন। এর ফলে জনসংহতি নেতৃবৃন্দ তথা পার্বত্যবাসীদের মনে আওয়ামী লীগ সম্পর্কে একটি পজিটিভ ধারণা তথা বিশ্বাস জন্মিয়েছে। অপরদিকে সভাগুলোতে অংশগ্রহণ করায় অলি কমিটির সকল কার্যক্রম সম্পর্কে আওয়ামী লীগ পূর্ণ ওয়াকিবহাল হয়েছে এবং চুক্তি সম্পাদনের ক্ষেত্রে প্রধান অন্তরায় তথা পার্বত্যবাসীদের দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে স্বচ্ছ হতে পেরেছে। এ সকল কারণেই আওয়ামী লীগের পক্ষে অতি দ্রুত সমস্যা সমাধান এবং মন্দির-মঞ্জিলে পৌছা সম্ভব হয়েছে।

অথচ বিএনপি দেখেও শিখতে পারলো না। কেবল ভুলের জগতেই রয়ে গেল। আওয়ামী লীগ চিফ হুইপ আবুল হাসনাত আব্দুল্লাহর নেতৃত্বে যে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক জাতীয় কমিটি গঠন করেছিল সেই কমিটিতে বিএনপি'র দুজন সাংসদ সদস্য ছিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্য এই যে, তারা একটি সভাতেও উপস্থিত হওয়ার মতো সংসাহসের পরিচয় দিতে পারেননি। ফলে কমিটিতে কি হচ্ছে না হচ্ছে তা না জেনেই বিএনপি শূন্যে গুলি ছোড়া শুরু করেছে। জাতির কাছে তাদের আসল অভিলাষ কিন্তু গোপন থাকেনি। বিরোধী দল হিসাবে সমালোচনা বিরোধিতা তারা করবেনই। কিন্তু শত্রুতা করার অধিকার তারা পেলেন কোথায়? বিএনপি এযাবৎ কত অভিযোগ এনেছে পার্বত্য চুক্তির বিরুদ্ধে সেই সকল অভিযোগসমূহ প্রমাণ করা তথা জাতির কাছে তুলে ধরার মহেন্দ্রক্ষণ এসেছিল বিএনপির সামনে। মহান জাতীয় সংসদে পার্বত্য বিলসমূহ উত্থাপিত হলে জাতি আশা করেছিল বিএনপি তাদের দাবির সমর্থনে বিলের দফাওয়ারী ক্রটি-বিচ্যুতি তুলে ধরে আওয়ামী লীগ সরকারকে আসামির কাঠগড়ায় দাঁড় করাতে পারবে-আওয়ামী লীগ সরকারকে ফাঁসিতে লটকানোর পাকা ব্যবস্থা বিএনপি করে ছাড়বে।

কিন্তু বিএনপির পলিসি মেকারগণ চরম হঠকারিতার আশ্রয় নিলেন। লণ্ডনের হোটেলগুলোকে কানা করে যে সকল ব্যারিস্টারগণ এসে ম্যাডাম জিয়ার পরামর্শদাতা সেজেছিলেন তারা মনে করেছেন তাদের ওকালতি চাল জনগণ ধরতে পারবে না। প্রায় পাঁচ হাজারের মতো সংশোধনী এনেছে বিলের উপর। বিশ্বের নজিরবিহীন ঘটনা এবং বিরোধী দলের নেত্রী দাবি করলেন সকল সংশোধনীর উপর প্রত্যেককে বলতে দিতে

হবে। এই পার্বত্য এলাকাতে আঞ্চলিক পরিষদ বিল পাস হবার পূর্ব পর্যন্ত রাজা শাসিত এলাকা ছিল। রাজতন্ত্রের স্থান ছিল। এখানে প্রজারা রাজাদের সাংবাৎসরিক পুন্যায় এসে কর দেয়। কই প্রেসিডেন্ট জিয়া কিংবা খালেদা জিয়া তাদের শাসন আমলে ফেনী কিংবা দিনাজপুরে কোন রাজাতো নিয়োগ করেননি। দরকারও হয়নি। একদা প্রেসিডেন্ট জিয়া উপজাতীয়দের বিতাড়িত করে ভিটাবাড়ি ছাড়া করেছিলেন। আজ পার্বত্য চট্টগ্রামের আঞ্চলিক পরিষদের চেয়ারম্যান একজন অ-উপজাতি হতে হবে এমন লোভ হবে কেন? বন্যেরা বনে সুন্দর শিশুরা মাতৃক্রোড়ে। যে কোন মানবতা, সভ্যতা, ভব্যতা কিংবা ন্যায়-নীতির আলোকে পার্বত্য অঞ্চলের চেয়ারম্যান একজন উপজাতি হবে এটাইতো বরং স্বাভাবিক সুন্দর ও যুৎসই। কই এর আগে বেগম জিয়া কি কোন দিন বলেছিলেন চাকমা, মুরং কিংবা অন্যান্য উপজাতীয়দের রাজা হবে একজন অ-উপজাতীয়? দিনাজপুরে কয়লা পাওয়া গেলে সেখানে রয়ালিটি চাওয়া হবে- কই দিনাজপুরে এ যাবৎ কখনও রাজপুণ্যা হয়েছে বলে তো খবর পাইনি। হঠাৎ করে সিলেট ও দিনাজপুরকে এনে পার্বত্য চট্টগ্রামের সাথে মেলানোর এই সন্দেহজনক মানসিকতার জন্ম হল কেন? বিএনপি যাই বলুক একটি বন্দুকের বিনিময়ে একগুচ্ছ ফুল কিংবা এক গুচ্ছ ফুলের বিনিময়ে একটি বন্দুক পরস্পর আদান প্রদানের মাধ্যমে পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়ি জনপদে যে নতুন যুগের সূচনা হয়েছে বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয়, ভৌগোলিক ও রাজনৈতিক জীবনে তা হয়েছে এক অতুজ্জ্বল স্বর্ণাক্ষর রচিত বিরল ইতিহাস। ব্রিটিশ তার পূর্ণ শাসন কালে সমগ্র উপমহাদেশকে শাসন করলেও তার আইনের নাগপাশে পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়ি মানুষদের বাঁধতে পারেনি। তার জন্য রচনা করতে হয়েছে ভিন্ন ম্যানুয়াল। পাকিস্তান ২৩ বছর পাহাড়ি মানুষদের তার রাষ্ট্র কাঠামোর গণ্ডিতে বাঁধতে পারেনি। এই সর্বপ্রথম শেখ হাসিনার দূরদর্শিতা এবং রাজনৈতিক প্রজ্ঞা ও সাহসের বলে যে শান্তিচুক্তি হয়েছে, যার প্রথমই বলা হয়েছে এই চুক্তি বাংলাদেশের ভৌগোলিক অখণ্ডতা ও সাংবিধানিক সার্বভৌমত্ব কাঠামোর উপর সম্পূর্ণভাবে আস্থা স্থাপন করে স্বাক্ষরিত হল। বস্তুত এই প্রথম পার্বত্য আদিবাসীদের লিখিত দলিল সম্পাদনের মাধ্যমে বাংলাদেশের সার্বভৌমত্ব মেনে নিয়ে গণপ্রজাতন্ত্রের নাগরিক হিসাবে নিজেদের ঘোষণা করলো।

সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয় বেগম জিয়া কাদেরকে সন্ত্রাসী বলছেন। লারমাদের? যাদের সাথে পুরো পাঁচ বছর বৈঠক করেছেন। তাহলে ঐ সকল বৈঠক কি নিছক প্রতারণা ও ভগ্নমির ফলপ্রসূত ছিল? খালেদা সরকার উপর্যুপরি যুদ্ধ বিরতি ঘোষণা করেছিলেন কাদের জন্য। যুদ্ধ হয় শত্রুদের সাথে। ঐ যুদ্ধ বিরতি ঘোষণার মাধ্যমে বিএনপি সরকার কি প্রকারান্তরে স্বীকার করে নেননি যে পার্বত্য চট্টগ্রামের বিচ্ছিন্ন একটি এলাকা। কিন্তু লারমাদের সাথে যুদ্ধ করলেন, অস্ত্র বিরতি করলেন, তখন ছিল পার্বত্য চট্টগ্রাম

স্বাধীন সার্বভৌম। আর আজ যখন যুদ্ধের পরিবর্তে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে শান্তি, হিটলিস্ট নিয়ে ঘোরাঘুরি না করে যখন পাহাড়ি বাঙালি পরস্পরকে ভাই বলে বুকে জড়িয়ে ধরছে তখন বেগম জিয়া এক দশমাংশ এলাকা ভারতের কাছে চলে যাচ্ছে বলে হুংকার ছাড়ছেন। আসলে সকলই গরল ভেল। স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব কিছু না। চাই কেবল ইস্যু। প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করার ইস্যু। এই সংসদের প্রথম দিন থেকেই ইস্যুর সন্ধানে উন্মাদ বিএনপি নিজেদের স্পিকারকে তার চেয়ারে অরক্ষিত রেখে অপমান করে বিএনপি ইস্যু খোঁজার যাত্রা শুরু করে সংসদ বর্জনের মধ্য দিয়ে। বর্তমানে এসেছে পার্বত্য ইস্যু নিয়ে। শান্তিচুক্তি বাতিল করতে হবে। অর্থাৎ তাদের দাবি মেনে নিলে যে সকল শান্তিবাহিনীর সদস্যরা অস্ত্র জমা দিয়ে নিজদের ঘরে ফিরে গেছে সরকার আবার তাদের ডেকে হাতে অস্ত্র তুলে দিয়ে দুদুখছড়িতে ছেড়ে আসতে হবে। আর আমাদের প্রিয় সেনা সন্তানদের পাঠাতে হবে গহীন বনে নিহত হবার জন্যে এবং এর মধ্যেই দেশের সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠিত হবে এবং এই কার্য সমাধান করার জন্য বিএনপি নেত্রী লংমার্চের ঘোষণা দিয়েছেন। লংমার্চ সফল করতে হলে দ্রুত পদসঞ্চালন পূর্বক তড়িৎ অগ্রসর হতে হবে। ধীর পায়ে অগ্রসর হওয়ার কোন অবকাশ এখানে নেই। লং মার্চের সাফল্য নির্ভর করে হাঁটার ক্ষিপ্ততা ও দ্রুততার উপর। বিএনপি'র চেয়ারপার্সন কি পারবেন দ্রুততার সাথে লং মার্চ এগিয়ে নিতে?

ধর্মের নামে বিষবৃক্ষকে লালন করা হচ্ছে: এখনই উৎপাটনের মোক্ষম সময়

১৯৭১-এর ১৬ ডিসেম্বর ঐতিহাসিক সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে মুক্তিবাহিনী ও মিত্র বাহিনীর কাছে টিক্কা নিয়াজী গং-এর আত্মসমর্পণের মধ্য দিয়ে এদেশীয় ধর্মব্যবসায়ীদের রাজনৈতিক অপমৃত্যু ঘটে। তারা হানাদার বাহিনীর দোসর, খুনি, নারী নির্যাতনকারী ও স্বাধীনতা বিরোধী চক্র হিসাবে ইতিহাসের আন্তাকুড়ে নিষ্কিপ্ত হয়।

স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের জাতির জনক বঙ্গবন্ধু নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন ধর্মভিত্তিক রাজনীতি। ধর্মের ট্রেডমার্ক ব্যবহার করে যারা হালুয়া-রুটির ধান্ধায় নিয়োজিত ছিল, যারা বাংলার মাটিতে জন্মগ্রহণ করে সদাসর্বদা ইসলামাবাদের রাজনৈতিক হেরেমে বসে তবক দেয়া পানে ঠোট রাঙ্গিয়ে পাঞ্জাবি প্রভুদের মনোরঞ্জে নিয়ত ব্যাপ্ত ছিল তারা ইতিহাসের সূত্র ধরেই নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছিল স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের পবিত্র মাটি থেকে। বাংলাদেশে ধর্মনিরপেক্ষ নীতি প্রতিষ্ঠার সাথে সাথেই মওদুদীপন্থী বাঙালি জাতিদ্রোহী জামাতচক্র সমাজ জীবন থেকে বিদায় নিয়েছিল।

কিন্তু স্বাধীনতার ২০ বছর পরে পুনরায় এই জাতিদ্রোহী ঘাতক রাজাকার চক্র আবার বাংলাদেশের রাজনৈতিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনে সক্রিয় হয়ে উঠলো কিভাবে? বস্তুত এদের রাজনীতিতে প্রত্যাবর্তন ঘটেছে 'বিসমিল্লাহ'র মাধ্যমে। যেদিন রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখল করে জেনারেল জিয়াউর রহমান দেশের সংবিধান থেকে বিসমিল্লাহ বলে ধর্মনিরপেক্ষতাকে নির্বাসন দিয়েছিলেন- সেদিনই ঘাপটি মেরে থাকা জামাত, রাজাকার চক্র আস্তে আস্তে কাছিমের মতো মাথা বের করতে শুরু করেছিল।

বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতার ঐতিহাসিক ঘোষণা কালুরঘাট বেতার মারফৎ পাঠ করে তৎকালীন মেজর জিয়াউর রহমান প্রথমে দেশবাসীর কাছে পরিচয় লাভ করে, পরে একজন সেক্টর

কমান্ডার হিসেবে মহান স্বাধীনতা যুদ্ধে তার অবদান রাখেন। বাঙালি বড় সহজ সরল জাতি। তারা কখনও অকৃতজ্ঞ নয়। তাই জিয়াউর রহমানের মুক্তিযুদ্ধের ভূমিকার পুরস্কারস্বরূপ জাতি তাকে বীরউত্তম খেতাবে ভূষিত করেন। কিন্তু দুর্ভাগ্য জাতির, এই বীরউত্তম জিয়াউর রহমানই একদিন জাতিকে বিস্মিত করে দিয়ে নিজের মসনদ চিরস্থায়ী করার জন্য স্বাধীনতা যুদ্ধের ঘোরতর দুশমন রাজাকার বাহিনীর অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা শাহ আজিজকে স্বাধীন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর পদে প্রতিষ্ঠিত করেন। বীর জিয়া যেদিন পরাজিত শত্রু শাহ আজিজের হাতে হাত রেখে রাজাকার পুনর্বাসনে ঝাপিয়ে পড়লেন, সেদিন '৭১-এর বিজয়ী জনতার কাছে তিনি আর বীরউত্তম থাকলেন না। কারণ বীর আর পরাজিত শত্রু একত্রে চলতে পারে না। এটাই ইতিহাসের শিক্ষা। বাংলাদেশে তাই হয়েছে।

সেই জিয়া থেকে শুরু করে এরশাদের স্বৈরশাসনের দীর্ঘ ১৬ বছর ধরে পর্যায়ক্রমে পুনর্বাসন করা হয়েছে স্বাধীনতা বিরোধীদের। একই সাথে ধর্মব্যবসাকে চালু করলেন আরও প্রচণ্ড গতিতে। পাক আমলের মওদুদী পন্থীদের শুধু উৎসাহিত করা হয়নি জিয়া-এরশাদ নিজেরাই বিভিন্ন আঙ্গিকে বিভিন্ন অবয়বে ধর্মকে রাজনৈতিক সুবিধা হাসিলের জন্য অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করতে থাকেন।

ধর্মের নামে সবচেয়ে বড় ধাপ্পাটি দেন আলহাজ হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ। তথাকথিত ঘোষণামূলে সৃষ্ট পার্লামেন্টের মাধ্যমে অষ্টম সংশোধনী পাস করে ইসলামকে রাষ্ট্রধর্ম ঘোষণার মধ্য দিয়ে। এখন দেখা যাক ইসলামকে রাষ্ট্রধর্ম করার কি সুফল ঘটেছে রাষ্ট্রীয় বা সমাজজীবনে। যারা 'ধর্ম-কর্ম করতেন না রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম হওয়ার পর তারা দৌড়ে গিয়ে মসজিদে মসজিদে কাতারবন্দী হয়ে ধার্মিক হয়ে গেছেন রাতারাতি? না, তা হননি। রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম ঘোষণা করার পর মদ, জুয়া, দুর্নীতি প্রভৃতি ইসলামবিরোধী কর্মকাণ্ড জিরো পয়েন্টে নেমে এসেছিলো? না, তাও আসেনি। বরং বেড়েছে। তবে রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম হওয়ায় হিন্দুদের মন্দিরে যাওয়া, বৌদ্ধদের প্যাগোডায় যাওয়া কিংবা খ্রিস্টানদের গীর্জায় যাওয়া বন্ধ হয়ে গেছে? না, তাও হয়নি। তবে রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম ঘোষিত হওয়ায় লাভ বা ক্ষতি হয়েছে কোথায়? অবশ্যই ক্ষতি হয়েছে। সর্বনাশ হয়েছে। এই রাষ্ট্রধর্ম একটি অশনিসংকেত। জাতির জন্য এখন একটি বিষবৃক্ষ। যতদিন এ বিষবৃক্ষটি বড় হতে থাকবে। পত্র-পুষ্প ফলেফুলে বিস্তৃত হতে থাকবে এবং বিষবৃক্ষটিকে এখনই সমূলে উৎপাটিত করতে না পারলে একদিন হয়তো আমাদের স্বাধীনতাও বিপদগ্রস্ত হয়ে উঠতেও পারে।

আজ থেকে বিশ বছর আগে কেন বাঙালি জাতি বঙ্গবন্ধুর ডাকে স্বাধীনতা যুদ্ধে ঝাপিয়ে পড়েছিল। ব্যক্তিগতভাবে ১৯৭১ সালে আমার বয়স ছিল ১৮ বছর। সুকান্তের ভাষায়

পাকিস্তান, আজিমপুরের কবরস্থান বলে' অস্ত্র উল্টে ধরেছি, তেমনি করে যদি শিমুলেরা, অঞ্জনেরা আর নির্মলেরা প্রিয় মাতৃভূমি বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষায় আত্ম বলিদানের পরিবর্তে বিপরীত ভূমিকা রাখে, তার জন্য দায়ী হবে কারা? শিমুলেরা, না যারা রাষ্ট্রধর্মের নামে বিভেদের দেয়াল তুলে জাতিকে দুর্বল করেছে তারা?

আমাদের জাতীয় জীবনের মস্তবড় ট্রাজেডি এই, মানুষ যখনই ঐক্যবদ্ধভাবে জীবন দিয়ে কোন আন্দোলন সফলতার দিকে নিয়ে যায় তখনই আন্দোলনের চেতনা, মানুষের স্বপ্ন মুখথুবড়ে পড়ে। হতাশার মহাসমুদ্রে নিষ্কিণ্ত হয় গোটা জাতি। কি প্রচণ্ড আত্মচেতনা নিয়ে এদেশের মানুষ এরশাদের স্বৈরশাসনের পতন ঘটালো। তারপর এরশাদের সবকিছুই তাড়িয়ে দেয়া হল। পাল্টিয়ে দেয়া হল সবকিছু। কোনটা ভেঙে আবার নতুন করে গড়া হল। কিন্তু সাম্প্রদায়িকতার যে বিষবৃক্ষটি এরশাদ রাষ্ট্রধর্মের নামে সযত্নে রোপণ করেছিল তার শেকড়টি উৎপাটন করা হল না। বরং বিভিন্ন মহল সেটিকে পানি দিয়ে, সার দিয়ে, কীটনাশক দিয়ে আদর যত্ন করে লালন পালন করেছে। এমনকি প্রগতিশীল ও সাম্প্রদায়িক রাজনৈতিক দল ও সংগঠনগুলো এনিয়ে আর উচ্চবাচ্য করছে না। শুধুমাত্র হিন্দু-খ্রীষ্টান-বৌদ্ধ ঐক্য পরিষদ ক্ষীণকণ্ঠে দাবী তুলছে মাঝে মধ্যে প্রেস বিজ্ঞপ্তি মারফত। প্রতিবাদের ভাষাও তেমন জোড়ালো নয়। অথচ জাতির অস্তিত্বের প্রশ্নে, ঐক্যের প্রশ্নে এ ব্যাপারে সঠিক সিদ্ধান্ত নেয়া খুবই জরুরি।

শহীদ মিনারের অবমাননা : দেখে যেন মনে হয় চিনি তাদের

এদের যেন চেনা চেনা মনে হয়। হ্যাঁ এরা আমাদের খুবই পরিচিত মুখ। আমি তাদের কথা বলছি যারা একুশের প্রভাবে শহীদ মিনার তছনছ করেছে। দলিত মথিত লাঞ্চিত করেছে। যাদের পায়ের নিচে মুখখুবড়ে পড়েছিল সভ্যতা। আমাদের হৃদয়ের লালিত্য আবেগ হঠাৎ আতর্জনাদ করে উঠেছিল সেই বিভৎস্য দৃশ্য দেখে। ফুলে ফুলে ভরে উঠা মহান শহীদ মিনারের পাদদেশের সেই তাড়ব দাঁড়িয়ে স্বচক্ষে যারা প্রত্যক্ষ করেছেন কিংবা বিটিভি'র পর্দায় দেখেছেন তাদের হৃদয়ে যে রক্তক্ষরণ হয়েছে দীর্ঘদিন পরও সে রক্তক্ষরণ মুছে যাবার নয়। এরা কারা? কেন এমনটি করতে গেলো। প্রথমেই বলেছি এদের চিনি। খুব ভালোভাবে চিনি। তাদের অস্থিমজ্জা, নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস, রক্ত-ধমনি সবকিছুর সাথেই আমাদের পরিচয় রয়েছে। এরা হলো তারা-

- যারা একদিন বলেছিল, উর্দুই হবে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা;
- যারা ৫২-র 'অমর একুশে ফেব্রুয়ারি' পাখির মতো গুলি করে মেরেছিল বাংলা মায়ের দামাল সন্তানদের;
- যারা বিএনআর-এ নাম লিখিয়ে বুদ্ধিজীবী সেজে পাক-প্রভুদের উমেদারী করার জন্য উর্দু হরফে বাংলা লেখার জন্য উদ্ভট লিঙ্গুয়া ফ্রাংকা চালুর ষড়যন্ত্র করেছে;
- যারা রবীন্দ্র সঙ্গীত বন্ধের নামে বাঙালির জাতীয় উৎস মূলে কুঠারাঘাত করতে উদ্যত হয়েছিল;
- যারা বাঙালিদের ভোটে নির্বাচিত যুক্তফ্রন্ট সরকারকে বন্দুকের নলের মুখে উৎখাত করেছিল;
- যারা বাঙালিদের স্বাধিকার দাবিকে নস্যাৎ করে দিতে অস্ত্রের ভাষা ব্যবহারের হুমকি দিয়েছিল;

- যারা বাবুল, ওয়াজিউল্লাহ, মনুমিয়া, আসাদ, ডা. জোহা, সার্জেন্ট জহুরুল হকদের বুক গুলি করে ঝাঝরা করে দিয়েছিল;
- যারা জাতির জনক বঙ্গবন্ধু সহ বাঙালির স্বাধিকার আন্দোলনের অকুতোভয় সেনানীদের কারা প্রকোষ্ঠে বন্দী করে রেখেছিল;
- যারা মসনদ টিকিয়ে রাখার জন্য ধর্ম ব্যবসায় নেমেছিল;
- যারা লক্ষ লক্ষ মানুষকে প্রিয় মাতৃভূমি ছেড়ে দেশান্তরিত করতে বাধ্য করেছিল;
- যারা গায়ের জোরে '৭০-এর নির্বাচনের রায় নস্যাৎ করে দিতে চেয়েছিল;
- যারা '৭১-এর ২৫ মার্চ নিষ্পাপ ঘুমন্ত বাঙালি জাতির উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছিল;
- যারা গণহত্যা চালিয়ে ৩০ লক্ষ বাঙালির জীবন কেড়ে নিয়েছিল এবং দু'লক্ষ মা বোনের আত্ম দলিত মথিত করেছিল;
- যারা উঠোনে শুকনো আমার মায়ের শুভ্র শাড়িকে অপবিত্র করেছিল;
- যারা আমার বোনের কোমল হাতের নম্র পাতার মেহেদীর রঙকে কলঙ্কিত করেছিল;
- যারা বিশ্ববিদ্যালয়ের বয়সী বটগাছটাকে উপড়ে ফেলেছিল;
- যারা শহীদ মিনারটিকে কামান দিয়ে গুড়িয়ে দিয়েছিল;
- যারা কেবলমাত্র জয়বাংলা বলার অপরাধে আমার চার বছরের শিশুর খুলি বেয়েনেট দিয়ে ফুটো করে জয়বাংলার পতাকা গৈঁথে দিয়েছিল এবং
- যারা আমাদের সূর্য সন্তান ও ভগবানের বর পুত্রদের চোখ বেঁধে রায়ের বাজার বধ্যভূমিতে নিয়ে খুন করেছিল।

কিন্তু এরপরও একটি অন্যরকমের ইতিহাসও তো ছিল। আমাদের জয়ের ইতিহাস। আর এতক্ষণ যাদের পরিচয় দিলাম সেই কুলাঙ্গাররা পাকিস্তানি হানাদারদের দোসর ও গণহত্যাকারী, নারী নির্যাতনকারী ও কুখ্যাত রাজাকার, আলবদর, আল-শামস প্রভৃতি গণ-ধীকৃত বিশেষণে ভূষিত হয়ে ইতিহাসের আস্তাকুড়ে নিষ্কিণ্ড হয়েছিল। তাহলে '৯৮-এর মহান একুশের প্রভাবে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে ফুলে ফুলে সুশোভিত বেদীমূলে এদের পুনর্ভাব ঘটল কিভাবে?

ডিসেম্বর ১৬, ১৯৭১ সাল। এই সকল কুলাঙ্গারদের প্রিয় 'আব্বাজান' জেনারেল নিয়াজীসহ ৯৫ হাজার কুখ্যাত খান সেনারা যেদিন ঐতিহাসিক সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে মিত্র বাহিনীর কাছে আত্ম-সমর্পণ করেছিল সেদিন গোটা জাতি বিজয়ে আত্মহারা হয়ে গিয়েছিলো। জাতি যখন 'জয় বাংলা' স্লোগান দিতে দিতে 'আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালবাসি' গাইতে গাইতে দুর্জয় প্রাণের আনন্দে রাজপথে উল্লাস মুখর সেদিন আমাদের অজান্তে এক নির্মম কাণ্ড ঘটে গিয়েছিল। এনবিআর-এর দালালরা পাকিস্তান

কারা? যুবক মানেই তো বিদ্রোহ। যুবক মানেই তো মাথা নত না করা। যুবক মানেই তো দেশপ্রেম। তবে এই কুলাঙ্গার যুবকরা আসলো কোথেকে।

আমরা যেদিন একাত্তরের রণাঙ্গণে পাক বাহিনীর সাথে যুদ্ধে লিপ্ত, সেদিন আমাদের জাতীয় জীবনে এক হৃদয় বিদারক ঘটনা ঘটে গিয়েছিল। রণাঙ্গণে আমরা ব্যস্ত ছিলাম বলে আমাদের মা বোনেরা সম্পূর্ণ অরক্ষিত ছিল। সেই সুযোগে কুখ্যাত পাক হানাদাররা ও তাদের এদেশীয় দোসররা আমাদের মা বোনের আক্রমণ নিয়ে ছিনিমিনি খেলেছিল। কিন্তু অলক্ষ্যে ঘটেছিল আর একটি ইতিহাস। আমাদের শান্তিবাহিনীর কর্তারা পাক সরকারের পোষা কুকুর তোষণ, পোষণ, পদলেহনীর মাধ্যমে মওকা লোটোর অভিপ্রায় নিয়ে কখনও জেনারেলদের, কখনও ব্রিগেডিয়ারদের, কখনও কর্নেল মেজর সাহেবদের, আবার ক্ষেত্রবিশেষ হাবিলদার সেপাহী সাহেবদের বাড়িতে ডেকে নিয়ে মেহমান বানিয়েছিলেন এবং এক সময় তাদের দিলখোশ করার জন্য কলেমা তৈয়ব পড়িয়ে নিজদের জায়া-কন্যাদের মেহমান সাহেবদের বিছানায় রেখে এসেছেন। অথবা রেখে আসতে বাধ্য হয়েছেন। নিশুতি রাতের অন্ধকার যখন কেটে গেছে তখন সাহেবরা উর্দি পরে ব্যারাকে ফিরে গেছে। পিছনে রেখে গেছে দীর্ঘশ্বাস। পাপের পঙ্কিল চিহ্ন। তাদের দুর্ভিক্ষের দগদগে স্বাক্ষর। এমনি ভাবে আমাদেরকে পেতে হয়েছে এক অনাকাঙ্ক্ষিত ও অবৈধ প্রজন্মের। ক্যালেন্ডার-এর দিকে তাকালে দেখা যাবে তাদের বয়স এখন ২৫/২৬-এর মধ্যে। বিভিন্ন দল কিংবা শিবিরের মিছিলে-মিছিলে এগুতে এগুতে তারা এখন কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় পেরিয়ে এসেছে। সেদিন একুশের সকালে শহীদ মিনারের পাদদেশে উন্মত্ততার জন্ম দিয়েছে যুবক নামের সেই কুলাঙ্গাররা। এরা যদি এখন শহীদ মিনারের পবিত্রতা মলিন করে কিংবা রামেন্দু মজুমদার-মুনতাসীর মামুনদের ধরে বেইজ্জত করে তবে ওদের দোষ দেয়া সমীচীন হবে না। এটা তাদের জন্মের দোষ। রক্তের দোষ।

ছোটকাল থেকে শুনে এসেছি যাদের ধমনিতে পুণ্য রক্ত স্রোত প্রবাহিত তারা সমসময় মা ও মামাদের পক্ষ কথ্য বলে। আর যাদের ধমনিতে কু-রক্ত প্রবাহিত তারা বাপের পক্ষ হয়ে মাকে কিলায়। মামুদের অপদস্ত করে। ঠিক সেদিন যেমনটি করেছিল, তারা শহীদ মিনারের পাদদেশে কিংবা টিএসসি'র মোড়ে। এই দূষিত রক্ত পরিশুদ্ধ করতে হবে। নইলে জাতির মুক্তি নেই।

চার দলীয় জোট, নিয়াজী তত্ত্ব ও ঢাকার রাজপথে কুশপুত্তলিকা এপিসোড

এয়েন একই তারে বাঁধা। অঙ্গুলি স্পর্শমাত্রই সুরের মূর্ছনায় অনুরণিত। এবারে কেবল টেকনাফ থেকে তেতুলিয়া নয়- একেবারে সিন্ধু থেকে বঙ্গোপসাগর - খাইবার গিরিপথ থেকে সেন্ট মার্টিন আইল্যান্ড। চলনে বলনে অবয়বে আগিকে একেবারে যেন সাত-পাকে বাঁধা।

ছোটবেলায় নিজ কানে শুনেছি একটি শৃগাল যখন বনের কোন প্রান্ত থেকে ‘হুকা-হুয়া’ বলে ডাক দিল তখন দিগ দিগন্ত মুখর করে সকল শৃগালকূল সমন্বরে নিশ্চুতি রাতের গভীর নিস্তব্ধতা ভেঙে দিয়ে হুকা-হুয়া, হুকা-হুয়া বলে এমন কোরাস জুড়ে দিত তখন মনে হতো যে শান্তিপ্রিয় মানুষের জন্য এর চেয়ে মস্তবড় বালাই বিধাতা বুঝি আর কিছুই সৃষ্টি করতে পারেনি।

বিএনপির আপোসহীন নেত্রীর কৃপায় জাতি এই পবিত্র রমজানের প্রাক্কালে এক চমৎকার উপহার পেয়েছে। খবরের কাগজে ছাপানো হয়েছে হরেক রকম ছবি। পত্রিকার পৃষ্ঠায় চোখ বুলালেই কি চমৎকার এক দৃশ্য জাতির সকলের হৃদয় কন্দরে আলোড়ন ঝড় তুলেছিল। আমরা যখন কারো আগমনে উদ্বেলিত হয়ে অথবা কারো বিয়োগ ব্যথায় ম্রিয়মাণ হয়ে সুযোগ পেলে পরিবারের সকলের একটি গ্রুপ ছবি তুলে কাঁচের ফ্রেমের মধ্যে পরম যত্নে বেঁধে রাখি স্মৃতির কোঠায়। তেমনই একটি পারিবারিক ছবি ফটোগ্রাফদের ফ্রেমে বাঁধা পড়ে পরবর্তীতে তার রোশনাইতে গোটা দেশ ঝলসিত হয়ে উঠেছিল। সেই পারিবারিক ছবিটি ছিল জিয়া পরিবারের উত্তরাধিকারীদের ছবি। তাঁর বিধবা স্ত্রী বেগম খালেদা, জিয়ার হত্যাকারী বলে কথিত হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ, এককালের নাগরিকত্বহারা এবং পরবর্তীতে জিয়ার কৃপায় বাংলাদেশে অবৈধ বসবাসকারী ঘাতক শ্রেষ্ঠ গোলাম আজম আর নারী নেত্রী বিরোধী তথা ফতোয়াবাজ মৌলবাদী গোষ্ঠীর পেয়ারের লোক ফজলুল হক আমিনী। এক কথায় এদের পরিচয় স্বাধীনতার পরাজিত শত্রু পরিবার।

মারহাবা, মারহাবা বলে যেই না মিন্টু রোডের সরকারি বাসভবনে বসে কোলাকুলি মহড়া শেষে এক লম্বা যুক্ত ইস্তেহার প্রকাশ, অমনি পুরানা দোস্ত মিত্রবাহিনী ও মুক্তিবাহিনীর সামনে প্যান্ট খুলে আত্মসমর্পণ করে জান ভিক্ষা নিয়ে পালিয়ে যাওয়া পরাজিত সেনাপতি জেনারেল নিয়াজী- পুরানো দোস্ত ও দোস্তাইনদের 'মোড়েল' চাঙ্গা করার জন্য পাকিস্তানে বসে মেরে দিলেন এক হৃদয় কেড়ে নেয়া তত্ত্ব। হুবহু চতুরদলীয় ঘোষণার রূপরেখার সাথে সামঞ্জস্য রেখে। কি আনন্দ! চারদলীয় নেতাদের হাতে যেন প্রিয় প্রভু সান্ডার তেল মেখে দিয়ে পোক্ত করে দিলেন, জজবার অধিকারী করে দিলেন। তাই সেই শক্তিশালী হাত তেড়ে আসলো হিংস্র হয়েনার মতো নিরীহ শান্তিপ্রিয় মা-বোনদের দিকে, ঠিক যেমনটা নিয়াজীরা করেছিল '৭১ সালে। একই সান্ডার তেল মাখা হাতে ক্ষতবিক্ষত করে দিল চট্টগ্রামের সাংবাদিকদের লালদীঘি ময়দানে।

বর্বর পাক হানাদার বাহিনী বাংলাদেশে কোন নারী নির্যাতন করেনি- এ কথায় বিস্মিত হবার কিছু নেই। নিয়াজীদের মতো কুলাঙ্গারগণ কোনদিনই নিজদের কু-কর্মের কথা স্বীকার করার সাহস অর্জন করতে পারেনি। কিন্তু তার চেয়েও কুলাঙ্গার এদেশের জনগ্রহণকারী পাক প্রভু নিয়াজীদের বংশদবদ, যারা নিয়াজীর কুশপুত্তলিকা কেড়ে নিয়ে তার গালে রেখে চুমো খায়। আসলে সেই কুলাঙ্গারদের মা-বোনরা কখনই পাক বাহিনী কর্তৃক ধর্ষিত হয়নি। কারণ ধর্ষণ করার আগেই এই জামায়াত আলবদর আল শামস্ চক্র কখনও তাদের বোনদের আবার কখনও তাদের বউদের জেনারেল সাহেব, ব্রিগেডিয়ার সাহেব হতে শুরু করে ল্যান্স নায়ক সাহেবদের বিছানায় দিয়ে এসেছে সন্ধ্যায় কলমা পড়িয়ে। আবার সুবহ সাদেকের পূর্বেই তালাক নিয়ে ঘরে ফিরিয়ে এনেছে। এই অপকর্ম এরা করেছে খান সাহেবদের মনোরঞ্জন করিয়ে, খুশি করিয়ে, পদ, পদবী ও লুটপাটের মাল ভোগ করার জন্য। এছাড়াও সেদিন যারা মিছিল থেকে ছুটে এসে আমাদের মা-বোনদের কাছ থেকে নিয়াজীর কুশপুত্তলিকা কেড়ে নিয়ে গেছে তারাও তেমন অন্যায় করেনি। এটা তারা করেছে রক্তের টানে। তাদের পিতাদের কুশপুত্তলিকা কেউ পোড়াতে নিচ্ছে তখন অবশ্যই জন্মদাতাদের প্রেস্টিজ রক্ষার জন্য মরিয়া হয়ে উঠবে, যুদ্ধংদেহী হয়ে উঠবে- এটাইতো স্বাভাবিক।

প্রশাসনকে বিভক্ত করে সর্বনাশ ডেকে আনবেন না

দেখেশুনে মনে হচ্ছে কোনও কোনও মহল ক্ষমতার মসনদ দখলের জন্য মরিয়া হয়ে উঠেছে। এসব মহলের আচার-আচরণ, কথাবার্তা ও লক্ষবাক্য দেখে সেই বহুল প্রচলিত কথাটিই মনে পড়ে যায়, ‘মুর্দা দোজখমে যাক, আওর বেহেশতমে যাক, মেরা হালুয়া রুটিছে কাম।’

স্বাধীন-সার্বভৌম জাতি হিসাবে আমরা একটি জ্বলন্ত ও জীবন্ত আগ্নেয়গিরির ওপর দাঁড়িয়ে আছি। স্বাধীনতা অর্জনের চেয়ে স্বাধীনতা রক্ষা করা কম কষ্টের নয়। গত বিজয় দিবসের এক আলোচনা মঞ্চ থেকে একজন নেতা অন্তত তিনবার বলেছিলেন, পৃথিবীর কোনও শক্তি আমাদের স্বাধীনতা কেড়ে নিতে পারবে না।

নেতাকে বিনীত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, আমাদের স্বাধীনতা কেউ কেড়ে নিতে পারবে না এমন আত্মবিশ্বাস তার মনে কিভাবে জন্মাল। তিনি সদুত্তর দিতে পারেননি। যা বলেছিলেন তা কেবল আবেগ মিশ্রিত কথা। নেতাকে বলেছিলাম, পাকিস্তান হাসিলের পর মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ বলেছিলেন Pakistan has come to stay কিন্তু ’৭১ সালে যখন জিন্নাহর পাকিস্তান আজিমপুরের গোরস্থান ধ্বনি দিয়ে বাংলাদেশ স্বাধীনতা সংগ্রামীরা যুদ্ধের ময়দানে বীরদর্পে এগিয়ে যাচ্ছিল তখন এই নেতা সেই মিছিলের অন্যতম সংগঠক ছিলেন। অতএব তাকে সহজেই স্বীকার করতে হয়েছে স্বাধীনতা এমন কোন জিনিস নয় যে, এটা কেউ নস্যাৎ করতে পারে না।

প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ্য, ভারত বংশোদ্ভূত ইংরেজ কবি রুডিয়র্ড কিপলিং লিখেছিলেন, ‘Many nations have come and persished and left no traces. History gives very nakedly one single and simple reason for all cases. They sail because their people were not fit’ একজন কবি হিসাবে কার্ডিয়র্ড কিপলিং-এর মধ্যে আবেগ কাজ করতে পারে। কিন্তু তার আলোচ্য বক্তব্যে আবেগের কোন অবকাশ রাখেননি। তিনি কেবল ঐতিহাসিক সত্যটিকেই নিজস্ব শব্দের অলংকারে

সমর্থকদের সরাতে হবে। এই ঘোষণা ও পরবর্তী সময়ে পাণ্টা ঘোষণার মধ্য দিয়ে জাতি অতি অস্থির ও উদ্বেগ সঞ্চারিত হয়ে লক্ষ্য করেছে প্রশাসনকে কি নিষ্ঠুর নির্মম ও নগ্নভাবে আওয়ামী লীগ ও বিএনপিকে বিভক্ত করা হচ্ছে। সরকার আসবে সরকার যাবে। এর বিচার বিশ্লেষণ করবে জনগণ। দেশের জনগণই হবে সরকার নির্ধারণের মূল শক্তি। একথা আমাদের সংবিধানে পরিষ্কারভাবে লেখা রয়েছে। কিন্তু দেশের সংবিধান কিংবা কোন আইনে কোথায় লেখা রয়েছে সরকার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে প্রশাসনও পরিবর্তন হতে হবে। বিগত সরকারের মন্ত্রীরা যেমন পদত্যাগ করে স্ব স্ব গৃহে চলে গেছেন তেমনিভাবে গত পাঁচ বছর প্রজাতন্ত্রের যেসব কর্মচারী তাদের সঙ্গে কাজ করেছে তাদেরও বিদায় নিতে হবে দায়িত্ব থেকে? অবস্থা তো এখন এমনিতেই মনে হচ্ছে বিএনপির চেয়ারপার্সন নিজেই ঘোষণা করেছেন প্রশাসন ও নির্বাচনকে সম্পূর্ণভাবে আওয়ামী লীগ সমর্থকদের হাত থেকে মুক্ত করতে হবে। এর অর্থ কি এই যে, এদের সরিয়ে যাদের আনা হবে তাদের হতে হবে বিএনপি সমর্থক। আর এদের সরিয়ে কোথায় তাদের বসানো হবে? যেখানেই বদলি করা হোক প্রজাতন্ত্রের কর্মচারী হিসাবে তাদেরকে তো কাজকর্মই করতে হবে। কিন্তু দেশের রাজনৈতিক একাংশ যদি এদের পার্টি বিশেষের সমর্থক বলে চিহ্নিত করে তবে তাদেরকে অন্যত্র বদলি নয়, প্রজাতন্ত্রের কর্ম থেকেই অব্যাহতি দিতে হয়। তখন অন্য রাজনৈতিক দল আরেক দল সরকারি কর্মচারীকে তাদের প্রতিপক্ষের সমর্থক বলে আখ্যায়িত করে তাদের অপসারণ চাইবেন। এটা জাতির জন্য মঙ্গলজনক নয়, কাক্ষিতও নয়। একটি উদাহরণ দেয়া যাক। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের শপথ গ্রহণের পরদিনই বিএনপি নেতৃত্বাধীন জোট তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধানের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। বেরিয়ে এসে সাংবাদিকদের সঙ্গে মতবিনিময় করার সময় অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে উল্লেখ করেন যে, নির্বাচন কমিশনের সদস্য শফিউর রহমানকে পদত্যাগ করার জন্য তারা বলবেন। তাদের ভাষায় শফিউর রহমান আওয়ামী লীগের সমর্থক। এ বিষয়ে পরবর্তী সময় একুশে টিভির সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে আওয়ামী সরকারের অন্যতম নীতিনির্ধারক জনাব তোফায়েল আহমদের দৃষ্টি আকর্ষণ করলে তিনি বলেন, 'তারা বলেছেন শফিউর রহমান আওয়ামী লীগের সমর্থক তাই তাকে পদত্যাগ করতে হবে। তাহলে বাকী চারজন কি বিএনপির সমর্থক? প্রশাসনকে ঘিরে এমন সর্বনাশা খেলা চলতে পারে না। এটা জাতির কাছে কাম্য নয়, কাক্ষিত নয়। মঙ্গলজনক নয়।'

আমাদের প্রশাসন তথা আমলাতন্ত্র সম্পর্কে অনেক অভিযোগ থাকতে পারে। গুরুতর অভিযোগও থাকতে পারে। তবে এটা সত্য নয় যে, সব ভাল কাজ রাজনীতিবিদগণ করেন আর সব দুর্কর্ম সম্পাদিত হয় আমলাদের দ্বারা। প্রকারান্তরে এটাও সঠিক নয় যে, দেশের সব অমঙ্গল ডেকে আনেন রাজনীতিবিদগণ আর দেশকে সোনায় সোহাগা ভরিয়ে তুলেন আমলাগণ। আসল সত্য এই যে, আমাদের যা কিছু অর্জন, যা কিছু

ভালমন্দ সবই রাজনীতিবিদগণ এবং প্রশাসনের যৌথ ফসল। কি খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন, কি '৯৮-এর ভয়াবহ বন্যা নিয়ন্ত্রণ অথবা পার্বত্য শান্তিচুক্তি আর পানি চুক্তি সবকিছুতেই আমাদের সরকারি কর্মকর্তাগণ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছেন। বরং রাজনৈতিক মহল থেকে কেবল দিকনির্দেশনা দেয়া হয়। আর সেটা বাস্তবায়নের কঠিন কঠোর দায়িত্ব পালন করে প্রশাসন। যখন যে রাজনৈতিক মহল রাষ্ট্র ক্ষমতায় বসবে তারাই তাদের মতো করে দিক দর্শন সাব্যস্ত করবে আর তা সঠিক সুচারুভাবে বাস্তবায়ন করবে প্রশাসন।

অতএব, এই ধ্রুব সত্যটি যেন আমরা ভুলে না যাই। ইতিমধ্যে ত্রিধারায় প্রবাহিত দেশাত্মবোধক রোগে বিভক্ত দেশে আমরা যেন আবার আরেকটি বিভক্ত প্রশাসন দাঁড় করিয়ে জাতিকে আরও গভীর সংকটে নিপতিত না করি সেদিকে দৃষ্টি রাখতে হবে সকল রাজনীতিবিদদেরই।

সাহিত্যের বরপুত্র শ্রী অনুদাশংকর রচিত কবিতাটি মনে পড়ে—

ভুল হয়ে গেছে বিলকুল
আর সব কিছু ভাগ হয়ে গেছে
ভাগ হয়নিকো নজরুল।
এই ভুলটুকু বেঁচে থাক
বাঙালি বলতে একজন আছে
দুর্গতি সব ঘুচে যাক।

অনুদাশংকর রায় এ কথা লিখেছিলেন ভারত তথা বাংলা বিভক্তির প্রেক্ষাপটে। আজ আমাদের জাতীয় জীবনের প্রেক্ষাপটকে লক্ষ্য করে আমাদের বলতে হবে আমরা জাতি হিসাবে বহুধাবিভক্ত হয়ে পড়েছি। ভেদ-বিভেদ ও হানাহানিতে সমাজের সর্বস্তরে কেবলই কুল ভাঙার প্রতিধ্বনি। এ অবস্থায় আমাদের আমলাতন্ত্র কোনমতে টিকে আছে। ভুল করে রাজনৈতিক মহল তাদের দু'ভাগ করে ফেলেননি। আমাদের প্রশাসনটি ঐক্যবদ্ধভাবে বেঁচে থাকলে জাতির দুর্গতি কিছু ঘুচতেও পারে। আমাদের রাজনৈতিক মহল বিষয়টি উপলব্ধি করবে বলে সবার প্রত্যাশা।

দেশপ্রেমের সোল এজেন্সি!

‘আর এক মুহূর্তও তার এ দেশে থাকার অধিকার নেই’, প্রচণ্ড উত্তেজনা মিশ্রিত কণ্ঠে এ বাক্যটি উচ্চারণ করেছেন জ্বালানী উপদেষ্টা ও বিনিয়োগ বোর্ডের চেয়ারম্যান মাহমুদুর রহমান। আর যাকে উদ্দেশ্য করে তিনি এই নিদারুণ শব্দ কথ্যটি উচ্চারণ করেছেন তিনি হলেন দেশের বরেণ্য অর্থনীতিবিদ ও সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগের (সিপিডি) নির্বাহী পরিচালক ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য। দেবপ্রিয় ভট্টাচার্যের অপরাধ, তিনি নাকি বাংলাদেশকে একটি খারাপ পণ্যের সঙ্গে তুলনা করেছিলেন।

দেবপ্রিয় ভট্টাচার্যের যদি এ দেশে এক মুহূর্তও থাকার অধিকার না থাকে তবে তিনি যাবেন কোথায়? কোন দেশে? তিনি (মাহমুদুর রহমান) তো মানহানির মামলা করেছেন মোট পাঁচ জনের বিরুদ্ধে। শুধু দেশ ছাড়তে বলেছেন দেবপ্রিয়কে। তবে রেহমান সোবহান, সৈয়দ মঞ্জুর এলাহী, এম সাইদুজ্জামান ও লায়লা রহমান কবির এরা কি করবেন তা বলেননি। যদিও তিনি দেশবরেণ্য এসব ব্যক্তিত্বকে ষড়যন্ত্রকারী ও নির্লজ্জ মিথ্যাচারী বলে আখ্যায়িত করে তাদের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহের মামলা করার পরামর্শ দিয়েছেন।

যারা সেদিন মামলা করে আসার পর মাহমুদুর রহমানের উগ্রমূর্তি একাধিক টেলিভিশনের পর্দায় দেখেছেন তারা অবশ্যই অনুভব করেছেন ড. দেবপ্রিয়ের বিরুদ্ধে তিনি কী জঘন্য সাম্প্রদায়িক বক্তব্য প্রদান করেছেন। প্রজাতন্ত্রের গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত থেকে তিনি যে বক্তব্য রেখেছেন তা আমাদের পবিত্র সংবিধানের ভিত্তিমূলে কুঠারাঘাতের শামিল।

এক শ্রেণীর রাজনীতিবিদ প্রায়ই দলীয় স্বার্থে এবং স্বভাব দোষে এভাবে সাম্প্রদায়িক বক্তব্য রাখেন। জাতীয় সংসদের পবিত্র ফ্লোরে দাঁড়িয়ে বাজে কথায় পটু এক মন্ত্রীকে বলতে শুনেছি, হালদার, মালদাররা (প্রয়াত; সুধাংশু শেখর হালদার) তো ডাবল প্রটেকশনে আছেন। তাদের আবার চিন্তা কি? আরেকজন সরকারি দলের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব বলেছেন, যখন দেখি বাবু সুরঞ্জিতের ইশারায় শেখ হাসিনাসহ আওয়ামী লীগের সদস্যরা সংসদ বয়কট করে বের হয়ে যায় তখন স্বভাবতই প্রশ্ন আসে, এই ইঙ্গিত আসে কোথা থেকে?

জেনারেল অরোরার মৃত্যু ও শোকপ্রস্তাব বিষয়ক জটিলতা : জাতির সঙ্গে এ কেমন প্রতারণা?

এবার বাজেট অধিবেশন শুরু হয়েছিল শোকপ্রস্তাব গ্রহণের মধ্য দিয়ে। রেওয়াজ অনুযায়ী জাতীয় সংসদের যে কোনো অধিবেশনের উদ্বোধনী দিনে শোকপ্রস্তাব আনা হয়। সাধারণত তা পাসও হয় সর্বসম্মতভাবে। এবারো এর ব্যতিক্রম হয়নি। কয়েকজন বরণ্য ব্যক্তির মৃত্যুতে স্পিকার মো. জমির উদ্দিন সরকার শোকপ্রস্তাব উত্থাপন করেন। এদের মধ্যে ছিলেন সাবেক ও বর্তমান সংসদ সদস্য এবং জাতিসংঘ শান্তি মিশনে কর্মরত অবস্থায় মৃত্যুবরণকারী সামরিক বাহিনীর সদস্য। এছাড়া বিদেশীদের মধ্যে ছিলেন পোপ জন পল।

সেদিন শোকপ্রস্তাবের ওপর বক্তৃতায় বঙ্গবীর কাদের সিদ্দিকী স্পিকারকে অনুরোধ জানিয়ে বলেছিলেন, এই তালিকায় সদ্যপ্রয়াত ভারতীয় ইস্টার্ন কমান্ডের সাবেক অধিনায়ক লে.জে. অরোরার নাম অন্তর্ভুক্ত করা হোক। জাতীয় বিবেচনায়ও বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ। বিশেষ করে একজন মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে কাদের সিদ্দিকীর কাছে এটি ছিল স্পর্শকাতর। কারণ, জে. অরোরা বাঙালি জাতি তথা স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের সঙ্গে ঐতিহাসিকভাবে জড়িয়ে আছেন। আমাদের জাতীয় জীবনের চরম ক্রান্তিকাল ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধের সময় তিনি ছিলেন মিত্র বাহিনীর ইস্টার্ন কমান্ডের প্রধান। জে. অরোরার কাছেই পাকিস্তান হানাদার বাহিনীর প্রধান লে.জে. নিয়াজী ৯৩ হাজার ঘাতক সৈন্যসহ আত্মসমর্পণ করে ঐতিহাসিক সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে। এই মহান ও অনন্য ঐতিহাসিক ঘটনার মধ্য দিয়েই পৃথিবীর মানচিত্রে সংযুক্ত হয় আরো একটি স্বাধীন ও সার্বভৌম দেশ। কাজেই বঙ্গবীর কাদের সিদ্দিকীর এই আবেদন অন্যান্য দাবীর মতো অতি সহজে নাকচ করা স্পিকারের পক্ষে সম্ভব ছিল না, তিনি তা

করেনওনি। তবে স্পিকার অতি সাদামাটাভাবে জানান, কারো নাম শোক প্রস্তাব থেকে বাদ গিয়ে থাকলে নামের তালিকায় তা সংযোজন করা হবে। বঙ্গবীর কাদের সিদ্দিকী পরের দিন আবার ফ্লোর নিয়ে আবেগাপ্ত কণ্ঠে বিষয়টির গুরুত্ব অনুধাবন করে জে. অরোরার মৃত্যুতে শোক প্রস্তাব গ্রহণে স্পিকারকে অনুরোধ করেন। জবাবে স্পিকার সংসদকে অবহিত করেন, অরোরার পূর্ণাঙ্গ জীবন বৃত্তান্ত সংগ্রহ করে যথাযথভাবে শোক প্রস্তাব গ্রহণ করা হবে।

এর কয়েক দিন পর আবার বাজেটের ওপর সাধারণ আলোচনায় দাঁড়িয়ে বঙ্গবীর কাদের সিদ্দিকী প্রথমে জে. অরোরার ওপর শোক প্রস্তাব গ্রহণের অঙ্গীকারের প্রতি স্পিকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। জবাবে সবাইকে অবাক করে দিয়ে তিনি জানান, প্রস্তাবটি ইতিমধ্যে পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে। হতভম্ব কাদের সিদ্দিকী বিস্ফোরিত চোখে আক্ষেপ করে বলেন, ‘আমাদেরকে বলা হয়েছিল জে. অরোরার পূর্ণাঙ্গ জীবন বৃত্তান্ত সংগ্রহ করে একটি আনুষ্ঠানিক শোকপ্রস্তাব গ্রহণ করা হবে। অথচ মাননীয় স্পিকার আপনি জানানেন শোকপ্রস্তাবটি ইতিমধ্যেই পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে। আমরা জানতে পারলাম না শোকপ্রস্তাবে কি লেখা হয়েছে, কেমন করে শোকপ্রস্তাব গ্রহণ করা হয়েছে এবং কিভাবে তা পাঠানো হয়েছে।’

স্পিকারের কথায় কাদের সিদ্দিকীও বুঝলেন, সাংসদরাও বুঝলেন আর সেই সঙ্গে গোটা জাতিও বুঝল জে. অরোরার ওপর গৃহীত শোক প্রস্তাবের দশা কি হতে পারে। আমাদের প্রিয় মাতৃভূমি হানাদারমুক্ত করায় যার বিশেষ অবদান ছিল সেই মহান ব্যক্তিত্বের মৃত্যুতে শোক প্রস্তাবের দৈন্যদশা আমাদের লজ্জায় নিমজ্জিত করেছে। জাতি হিসেবে আমরা কখনো এতটা কৃপণ ছিলাম না। আসলে এখানে যুৎসই শব্দটি হচ্ছে অকৃতজ্ঞ। তবে এই শব্দটির ব্যঞ্জনা ও দ্যোতনা দুটিই আমাদের জাতীয় চরিত্রের প্রতি কটাক্ষস্বরূপ হতে পারে বিধায় কৃপণ শব্দটি ব্যবহার করা হলো। আবহমানকাল থেকে বাঙালিরা বীরের জাতির মর্যাদা ভোগ করে এসেছে। কারো এতটুকু অবদান ও ত্যাগ তারা কখনো খাটো করে দেখার চেষ্টা করেনি। বরং সবার অবদান হৃদয় উজাড় করে দিয়ে স্বীকার করে নিয়েছে।

আমাদের মুক্তিযুদ্ধের কথায়ই আসা যাক। অনেকেই মুক্তিযুদ্ধে গিয়েছিলেন। কেউ বুঝে গিয়েছেন, কেউ আবার না বুঝে গিয়েছেন। আবার কেউ ‘অন্য উদ্দেশ্য’ নিয়েও মুক্তিযুদ্ধে যেতে পারেন। আমাদের মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে ও পরবর্তীতে এমন অনেক ঘটনা ঘটেছে যাতে প্রতিভাত হয়েছে যে, অনেক বীরযোদ্ধা মুক্তিযুদ্ধে গেলেও হয় মুক্তিযুদ্ধের চেতনা

হতে লাগল। আমরা যে মুহূর্তে খেতে যাওয়ার জন্য উসখুস করছিলাম তখন আমাদের হৃদয় কাঁপিয়ে বাঁশির হুইসাল বেজে উঠল। এবার বাঁশি বাজালেন মেজর রূপ সিং। এই বাঁশির হুইসালে আমরা আতঙ্কিত হয়ে পড়লাম। নিশ্চয়ই কোনো এক অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা ঘটিয়েছে আমাদের কোন সহযোদ্ধা এবং দেশে ফেরার পথে আমাদেরকে হয়তো বকাঝকা খেতে হবে। তবুও হুইসাল বাজার সঙ্গে সঙ্গে আমাদেরকে ‘ফল-ইন’ হতে হল।

আজ স্বদেশ ফেরার পালা। একদিন টাডুয়াতে এসেছিলাম কাঁচামাল হিসেবে। আজ ফিরে যাচ্ছি দুর্দান্ত গেরিলা যোদ্ধা হিসেবে। শত্রুর মুখোমুখি হওয়ার তীব্র আকাঙ্ক্ষায় আমরা সকলে উন্মুখ। এমনি সময় না জানি কোন অবিমুখ্যকারী দুষ্কর্মের জন্য আমাদেরকে আবার বকাঝকা খেতে হবে। তবে মেঘের ফাঁকেও রোদের ঝলক দেখলাম। ‘ফল-ইন’-এর সামনে এসে দাঁড়ালেন মেজর দেবদাস। টাডুয়া মিলিটারি একাডেমির সবেধন নীলমণি একমাত্র বাঙালি অফিসার। তাও মেডিকেল কোরের। বাঙালিত্বের কী বিরাট আকর্ষণ, কী দূরন্ত এর প্রাণশক্তি এই দূরদেশে অবস্থিত টাডুয়া এসে তা বুঝতে পেরেছিলাম অস্থিমজ্জায়। যখনই কোনো দুঃসংবাদ কিংবা বিপদ সমাগত মেজর দেবদাস সাক্ষাৎ দেবতার মতো আমাদের মধ্যে এসে হাজির। একে তো বাঙালি, তার উপরে নাম দেবদাস। কোথায় মেজর ফেজর। আমরা সকলেই তাকে ডাকতাম দেবদা বলে। এটা তিনি আশাও করতেন। আজও যখন লক্ষ্মীর রেল স্টেশনে আমরা অজানা অমঙ্গল চিন্তায় অধীর অপেক্ষমান তখন এই ভেবে সান্ত্বনা পেলাম যে, বকা খেলেও যাওয়ার বেলায় বাঙালির মুখ থেকে বকা খাব। আর দেবদা কতটুকুই বকতে পারবেন?

মনের এই বিক্ষিপ্ত অবস্থায় দেখলাম বিভিন্ন বয়সের একদল মহিলা আমাদের দিকে এগুচ্ছে। এবার আর বিপদ অজানা রইল না। এমন একটি আশঙ্কা আমরা গুরুত্বই করেছিলাম। ট্রেন থামার সঙ্গে সঙ্গেই কয়েকজনকে দেখলাম নিকটস্থ কলোনির দিকে যেতে। সন্দেহ হয়েছিল তারা কী জানি কী করে বসে। এবার মহিলাদের আসতে দেখে আমরা নিশ্চিত হলাম আমাদেরই কোনো কোনো বন্ধু যারা পার্শ্ববর্তী কলোনিতে গিয়েছিল না জানি তারা কী গর্হিত কাজই করে ফেলেছে।

কিন্তু মহিলাদের বর্ণাঢ্য মিছিলটি খুব কাছে এলে কেমন জানি অন্য একটি আবহ, অন্য একটি মেজাজ আমাদের কাছে অনুভূত হল। সকলেই সুন্দর করে পরিপাটি সাজে সজ্জিত। প্রত্যেকের হাতেই আল্পনা আঁকা ডালাকুলা। একটু আবেগ ও কম্পন জড়িত

কঠে মেজর দেবদাস সামরিক কায়দায়ই একটি ছোট ভূমিকা দিতে গিয়ে বললেন, আগত এই মহিলাগণ নিকটস্থ সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের কর্মচারীদের আবাসিক কলোনির বাসিন্দা। তোমাদের কয়েকজন ছেলে এই কলোনিতে গিয়ে জল খেতে চাইলে প্রথমে মহিলারা শুনতে পায় এই ট্রেনে জয়বাংলার মুক্তিযোদ্ধারা ট্রেনিং শেষে স্বদেশে শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধ করতে যাচ্ছে। এতদিন তারা বিভিন্ন পত্রপত্রিকা কিংবা রেডিও-টিভিতে মুক্তিযোদ্ধাদের বীরত্বপূর্ণ যুদ্ধের কথা পড়েছে কিংবা শুনেছে। আজ তাদের সৌভাগ্য হয়েছে পাকিস্তানি দখলদার বাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধ করতে কিছু বাংলা মায়ের তরুণ ট্রেনে চড়ে যাচ্ছে, এখন তারা তোমাদেরকে এক নজর দেখার ও আর্শীবাদ করার জন্য এখানে উপস্থিত হয়েছেন।

এরই মধ্যে দেবদা একজন পৌঢ় গোছের মহিলাকে ইঙ্গিত করলে তিনি সামনে এসে অত্যন্ত প্রফুল্লচিত্তে বললেন, তোমরা আমাদের ভাই ও সন্তানতুল্য। তোমাদের বীরত্বপূর্ণ সংগ্রাম ও যুদ্ধ জয়ের খবরে গোটা বিশ্ব আজ মুগ্ধ। আমরা তোমাদের বিজয় কামনা করি। তোমাদের শুভ কামনা করি। আমরা আজ আরো আনন্দিত এই জন্য যে, আজ ভাইফোঁটার দিন। রাখিবন্ধনের দিন। তাই আমরা তোমাদের শুভ কামনায় রাখি বেঁধে দিতে এসেছি। তোমাদের কোমল-কঠিন হাতে, আজ ভাইফোঁটা দিয়ে শুভ কামনায় সিঁদুর পরিয়ে দিতে চাই তোমাদের প্রশস্ত ললাটে। এরপরই প্রতি লাইনে দুজন করে মহিলা হাতে ডালা-কুলা নিয়ে আমাদের প্রত্যেককে রাখি বেঁধে দিতে লাগলেন এবং একই সঙ্গে ললাটে রক্তলাল সিঁদুর ও চন্দনের ফোঁটা।

দীর্ঘদিন আমরা দেশান্তরী। প্রিয় মাতৃভূমিতে আমরা আমাদের মা-বোন, ভাবীদের রেখে এসেছি সম্পূর্ণ অরক্ষিত অবস্থায়। আমরা অনেকেই জানি না আমাদের স্নেহময়ী জননী বেঁচে আছেন নাকি পুত্রশোকে মৃত্যুর শীতল কোলে ঢলে পড়েছে। আমরা অনেকেই জানি না আমাদের জায়াদের নম্র হাতের কোমল পাতায় কোনো গ্লানি কলঙ্কিত করেছে কিনা, বোনদের রজনীগন্ধার মতো পবিত্রতা এখনো নিষ্কলুষ আছে কিনা। এমনি মুহূর্তে আজ লক্ষ্মৌর রেলস্টেশনে ছুটে আসা সরকারি আবাসিক কলোনির মাতা-ভগ্নিদের দেখে আমাদের চোখের সামনে ভেসে এসেছে স্বদেশের ভূমিতে অরক্ষিত অবস্থায় ফেলে আসা আমাদের প্রিয়জনদের কথা। প্রিয় মাতৃভূমির মাটি ও মানুষের কথা। হিজল ফুল, কটকারীর ঝোপ, তিল্লপাতার হলুদ ফুল, কাজলা দিঘি, শানবাঁধানো ঘাট সবকিছুর কথা।

সেই আকুল আবেগ মাখা লক্ষ্মৌর স্টেশন ছেড়ে এসেছি আমরা পঁয়ত্রিশ বছর আগে।

এরই মধ্যে ভারত-বাংলাদেশের ওপর দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে কত জলোচ্ছ্বাস, বন্যা, ক্ষরা ও প্রকৃতির বিপর্যয়। পঁয়ত্রিশ বছর পেরিয়ে আসলেও মনে হয় এই সেদিনের কথা। আমরা আমাদের স্বাধীনতার সুখ ছিনিয়ে আনতে তিরিশ লাখ প্রাণের রক্ত ঢেলে দিয়েছি। একইসঙ্গে আমাদের মাতৃভূমি হানাদারমুক্ত করতে আত্মবিসর্জন দিয়েছে সাড়ে এগারো হাজার ভারতীয় সৈন্য। পরদেশের স্বাধীনতা অর্জনের জন্য এই আত্মদান নিশ্চয়ই তাৎপর্যপূর্ণ। এই রক্তের রাখি বন্ধনের মধ্য দিয়ে সূচনা হয়েছে বাংলাদেশ-ভারতের মধ্যে মৈত্রীর সেতুবন্ধন।

আমরা যখন বাংলাদেশ-ভারত সম্পর্কের কথা বলব তখন অবশ্যই ওই সাড়ে এগারো সহস্র ভারতীয় জওয়ানদের সর্বোচ্চ আত্মত্যাগের কথা স্মরণ করব, বিবেচনায় আনবো। আমাদের বিবেচনায় আনতে হবে লক্ষ্মীর রেল স্টেশনে বাংলাদেশের মুক্তিযোদ্ধাদের ও ভারতীয়দের মধ্যে সৃষ্ট রাখি বন্ধনের কথা। বাংলাদেশ-ভারত সম্পর্কের ক্ষেত্রে আমাদেরকে অবশ্যই সাহসী হতে হবে। আমাদেরকে দৈন্য ঘুচাতে হবে। আমাদের কোনো একটি স্বাধীনতা দিবসে অথবা বিজয় দিবসে আমরা মিত্র বাহিনীর পূর্বাঞ্চলীয় প্রধান লে.জে. অরোরাকে আমন্ত্রণ জানাতে পারিনি, কিংবা ভারতীয় যোদ্ধাদের স্মরণে একটি স্মৃতিস্তম্ভও নির্মাণ করতে পারিনি। এই দৈন্য বীরের জাতি হিসেবে আমাদের জন্য গ্লানিকর। ইতিহাসের তাগিদেও এটা আমাদের করা দরকার। আমরা শৌর্যবীর্যশালী বীরের জাতি। আমাদের সম্মানবোধ রয়েছে। স্বাধীনতার পর চট্টগ্রাম বন্দরকে মাইনমুক্ত করতে গিয়ে রেটকিন নামে একজন সোভিয়েত নাবিক মৃত্যুবরণ করেছিলেন। কর্ণফুলীর তীরে আমরা রেটকিনের স্মৃতিস্তম্ভ প্রতিষ্ঠা করেছি। প্রতি বছর মানুষ গিয়ে রেটকিনের আত্মত্যাগের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে আসে। এটাই শোভন। এটাই কর্তব্যবোধ। একই কারণে আমাদের স্বাধীনতার বেদিমূলে আত্মোৎসর্গকৃত ভারতীয় বীরদের জন্য গড়ে তোলা উচিত ছিল এক বিশাল স্মৃতিসৌধ।

একইসঙ্গে আজ ভারতকেও একটি ধ্রুব সত্য অনুধাবন করতে হবে- ভারত আমাদের নিকট প্রতিবেশী। বিশাল প্রতিবেশী। এমতাবস্থায় আমাদের মনস্তাত্ত্বিক বিষয়টিকে উপেক্ষা করার কোনো সুযোগ ভারতের থাকতে পারে না। আমাদের সকল সমস্যা ছোট কিংবা বড় সবই আমাদের অনুকূল পরিবেশের মাধ্যমে সমাধান করার উদ্যোগ নিতে হবে ভারতকেই। বাংলাদেশকে যদি তার সমস্যা সমাধানের জন্য অন্য কারও দ্বারস্থ হতে হয় সেটা ভারতের জন্যও হবে দুঃখ ও বেদনার। রাজনৈতিক পরাজয়ও।

অতএব এটা পরিষ্কার যে, বাংলাদেশ-ভারত সম্পর্কের সেতুবন্ধন করতে গিয়ে কেবল

প্রচলিত রাষ্ট্রাচার কূটনৈতিক কলাকৌশল ও রাষ্ট্র বিজ্ঞানের সুনির্দিষ্ট পরিভাষার মাধ্যমে সম্পন্ন করা সম্ভব হবে না। এই দুই বন্ধুপ্রতিম দেশের সম্পর্কের ক্ষেত্রে অবশ্যই কিছু আবেগের স্থান থাকতে হবে যেই আবেগের তাড়নায় পঁয়ত্রিশ বছর আগে লক্ষ্মীর সরকারি কলোনির মা-বোনেরা ঘর থেকে ছুটে এসেছিল জয়বাংলার দামাল ছেলেরদের হাতে রাখি পরিয়ে দিতে, ভাইফোঁটার রক্তিম তিলক পরিয়ে দিতে তাদের সৌম্য ললাটে।

জেনারেল অরোরার স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে সংসদে কিংবা রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে শোকপ্রস্তাব গ্রহণ করে আমরা কখনো কোনো অবস্থায় ছোট হতাম না। ইতিহাসের মূল্যায়নের প্রশ্নে কোনো প্রকার কপটতা কিংবা কার্পণ্য করার অবকাশ নেই। আমরা পাকিস্তানী জেনারেল জানজুয়ার মৃত্যুতে রাষ্ট্রীয়ভাবে শোকপ্রকাশ করেছি। যারা আমাদের ৩০ লক্ষ তাজা প্রাণ কেড়ে নিয়েছে, দু'লক্ষ মা-বোনের সম্ভ্রম কলুষিত করেছে সেই হানাদার বাহিনীর জেনারেলদের প্রতি আমাদের দরদের ঘাটতি হয়নি। অথচ আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধের মিত্রবাহিনীর প্রধান জে. অরোরার মৃত্যুতে শোকপ্রকাশ নিয়ে আমরা কূটকৌশলের আশ্রয় নিয়েছি। এহেন লুকোচুরি খেলা প্রকারান্তরে বীরের জাতি হিসাবে আমাদেরকে খাটো করেছে। জাতির সাথে এমন আত্মপ্রতারণা সংশ্লিষ্ট মহল না করলেও পারতেন।

যত দোষ নন্দ ঘোষ: জামাত-বিএনপি'র ভারত ও আওয়ামী আতঙ্ক

আচমকা এক ঝড়ো হাওয়ায় তছনছ করে দিয়ে গেলো আমাদের সাজানো-গোছানো পোশাক শিল্পকে। এটা ছিল সম্পূর্ণ অনভিপ্রেত, মর্মান্তিক ও দুঃখজনক। তবে কোনোমতেই অপ্রত্যাশিত ছিল না। আমাদের তৈরি পোশাক শিল্প গড়ে উঠেছে অনেকটা 'বাইরে ফিটফাট ভিতরে সদরঘাট' গোছের। বাইরে থেকে এই সেক্টরকে যতোই চাকচিক্যময় ও আকর্ষণীয় মনে হয় এর ভিতরটা ততোই ফাঁকা। অসন্তোষ, অন্যায়, শোষণ, বঞ্চনা এই উদীয়মান পোশাক শিল্পকে সমস্যার গভীরে নিষ্ক্ষেপ করেছে। সাম্প্রতিককালে যা সংঘটিত হয়েছে তার পুরোটাই ছিল দীর্ঘ দিনের এই পুঞ্জিভূত ক্ষোভ ও অসন্তোষের বহিঃপ্রকাশ। এটা ছিল ঘটনা পরম্পরার অভিসম্পাতী পরিণতি।

তবে খালেদা-নিজামী সরকার এই অমোঘ সত্যের দিকে এগুলো না। বিএনপি'র মহাসচিব কোন রাগ-ঢাক না করে প্রকাশ্যে ঘোষণা দিলেন গার্মেন্টস সেক্টরের এই সর্বনাশা খেলায় আওয়ামী লীগ 'বাতাস' দিয়েছে। এমন একটি নাশকতামূলক কর্মকাণ্ডের পিছনে আওয়ামী লীগের ইচ্ছা থাকবে না, উস্কানি থাকবে না, মান্নান ভুঁইয়া সাহেবরা এটা কল্পনাও করতে পারেন না। খোদ বিএনপি'র চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়া বলেছেন যে সকল মহল (ভারত) বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও জাতীয় প্রবৃদ্ধি সহ্য করতে পারে না সেই সকল মহলই বাংলাদেশের বিকাশমান তৈরি পোশাক শিল্পকে ধ্বংস করতে অপতৎপরতা চালাচ্ছে। তিনি আরো বলেন, ঐ সকল বিদেশী প্রভুদের মনোরঞ্জনের জন্য তাদের এদেশীয় পদলেহী বংশবদগণ এই ধ্বংসাত্মক কাজে লিপ্ত। জামায়াত ইসলামীর পক্ষ থেকে পোশাক শিল্পের এই ভয়াবহ অস্তিত্বতাকে ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থা 'র'-এর কর্মকাণ্ড বলে পরিষ্কার ভাষায় জানিয়ে

তবে সংশ্লিষ্ট মহল নিজেরাই জানেন এটা কেবলই রাজনীতি। একেবারেই দুই রাজনীতি। তারা এটাও জানেন যে, আমরা গার্মেন্টস শিল্পে উদ্ভূত পরিস্থিতির কারণ অনুসন্ধান করে যদি সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছতে না পারি এবং তার সমাধানের লক্ষ্যে বাস্তবমুখী ও ফলপ্রসূ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে না পারি, তবে তার খেসারত শুধু বিএনপি-আওয়ামী লীগকেই বহন করতে হবে না, এর জন্য মূল্য দিতে হবে গোটা জাতিকে। আর ভারত আমাদের বৃহৎ প্রতিবেশী ও বন্ধু দেশ। কারণে-অকারণে ভারতকে আমাদের সবকিছুর মধ্যে টেনে আনা আমাদের শোভন নয়, উচিতও নয়।

আসল কথা যেকোন মূল্যেই আমাদের পোশাক শিল্পকে বাঁচাতে হবে। জাতীয় অর্থনীতিকে মজবুত করার অন্যকোনো পথ খোলা নেই। কেবল অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকেই নয়, সামাজিক দৃষ্টিকোণ থেকেই আমাদেরকে এই শিল্পের অস্তিত্ব রক্ষায় মনোযোগী হতে হবে। কারণ এটা অনস্বীকার্য যে, দেশের একদা নিষ্পেষিত নারী সমাজের ক্ষমতায়নে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে গার্মেন্টস সেক্টর।

সম্প্রতি পোশাক শিল্পে যে ঝড়ের তাণ্ডব বয়ে গেলো তার অন্যতম কারণ ছিল অসংগঠিত, অজ্ঞ ও অন্ধ শ্রমিক নেতৃত্ব। আমাদের দেশে শ্রম আন্দোলনের গৌরবময় ইতিহাস ও ঐতিহ্য রয়েছে। পাকিস্তানী আমলে পাঞ্জাবি শোষক চক্রের বিরুদ্ধে আমাদের শ্রমিক সমাজ সফল নেতৃত্ব দিয়েছিল। ষাট-সত্তর দশক জুড়ে আমাদের শ্রমিক আন্দোলন পরিচালিত হয়েছে মার্কসীয় তত্ত্বও বোদ্ধা দক্ষ দেশপ্রেমিক শ্রমিক নেতৃত্ব দ্বারা। এমনকি বাংলাদেশেও সামরিক শাসনের নিগড়ে থেকে আমাদের শ্রমিক নেতারা সফল নেতৃত্ব দিয়েছেন। স্ফপ (শ্রমিক-কর্মচারী ঐক্য পরিষদ)-এর গৌরবদীপ্ত ও সফল আন্দোলনে এ দেশে অনেক শ্রমিক স্বার্থমুখী আইন প্রণীত হয়েছে। আমাদের শ্রম আইনসমূহ, তথা আইআরও এবং আইআরআর এখন পুরোটাই শ্রমিক স্বার্থমুখী। ২/১টি কালো অধ্যায় ছাড়া মালিকের পক্ষে খুব কমই আইন রয়েছে যতো না আছে শ্রমিকদের পক্ষে। তবে শ্রমিকদের দুর্ভাগ্য তাদের পক্ষে আইনগুলোর সুফল তারা পাচ্ছে না। আইনি জটিলতা তথা আমাদের দেশের বিরাজমান ক্রটিপূর্ণ বিচার ব্যবস্থার জন্য।

কিন্তু আমাদের দেশে গার্মেন্টস শিল্পের অবস্থা ভিন্নতর। এখানে প্রায় ক্ষেত্রেই শ্রমিকদের বঞ্চিত করা হয়েছে আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত তাদের ট্রেড ইউনিয়ন করার মৌলিক অধিকার থেকে। মালিকরা তাদের স্বার্থ কুক্ষিগত করতে শ্রমিকদের বঞ্চিত করেছে নিয়মতান্ত্রিকভাবে দরকষাকষি করার সকল অধিকার থেকে। ফলে তাদের অধিকার রক্ষা করতে গিয়ে কিংবা অধিকার রক্ষার নামে পোশাক শিল্পে উদ্ভব হয়েছে অসংগঠিত

শ্রমিক আন্দোলন। আমরা জানি অন্ধের হাতে মশাল দিলে সে ঠিকই আলো জ্বালাবে, তবে একই সঙ্গে ঘরও পোড়াবে। অসংগঠিত, অনিয়ন্ত্রিত ও বেআইনিভাবে গড়ে ওঠা শ্রমিক আন্দোলনের নেতৃত্ব এই অন্ধের হাতে মশাল দেয়ার মতোই। তাদের হাতেই সাম্প্রতিক পোশাক শিল্পে এই মহাপ্রলয়কাণ্ড ঘটেছে। দেশ প্রেমিক, ত্যাগী ও পোড়খাওয়া শ্রমিক নেতৃত্ব গার্মেন্টস শিল্পের শ্রমিকদের সংগঠিত করার সুযোগ পেতো তবে নিশ্চয়ই শ্রমিক আন্দোলনের নামে ২৩ মে-র ভয়াবহ ধ্বংসযজ্ঞ জাতিকে প্রত্যক্ষ করতে হতো না।

অতএব, আমরা যদি অতিদ্রুত এই শিল্পে আইনানুগ ও সুস্থ ট্রেড ইউনিয়নের ধারা প্রবর্তন করতে না পারি তবে এই অন্ধ নেতৃত্ব আবার যেকোন সময় তাদের মশাল জ্বালিয়ে গোটা শিল্প পুড়ে ছারখার করে দিতে পারে। এই শিল্পে আইনানুগ ট্রেড ইউনিয়নকে নিরুৎসাহিত করা হয় বিধায় আমাদের বিবেকবান সুস্থ ও শিক্ষিত ট্রেড ইউনিয়ন নেতৃত্ব সেখানে অনুপস্থিত। এই সুযোগে সেখানে গড়ে উঠেছে অসুস্থ নেতৃত্ব। পোশাক শিল্পকে ফিরিয়ে আনতে হবে বিবেকবান নেতৃত্বের কাছে। এর জন্য পোশাক শিল্পে জরুরি ভিত্তিতে চালু করতে হবে সুস্থ ধারার ট্রেড ইউনিয়ন। এ প্রসঙ্গে মার্কস এঙ্গেলসের কথা আবার স্মরণ করতে হবে, পুঁজিবাদী শিল্পোৎপাদন বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে সর্বহারাদের সংখ্যাও বাড়তে থাকে, তাদের ঐক্য ব্যাপকতর হয় এবং তাদের শক্তি বেড়ে যায়। তারা নিজেদের শক্তিমত্তাকে বেশি করে অনুভব করতে থাকে। কিন্তু এ পর্যায়ে শ্রমিকরা বিচ্ছিন্নভাবে তাদের সংগ্রামে বিজয়ী হলেও সেগুলো সাময়িক ফল বয়ে আনে মাত্র। তাদের সংগ্রামের প্রকৃত ফল এসব বিক্ষিপ্ত বিজয় অর্জনের মধ্যে নয়, তা নিহিত থাকে তাদের সদাবিকাশমান ট্রেড ইউনিয়নের মধ্যে।' অতএব, পোশাক শিল্পের মালিক ও শ্রমিক উভয়ের স্বার্থেই এই মুহূর্তে প্রয়োজন সুস্থ ট্রেড ইউনিয়ন ধারা প্রবর্তন করে সকল সমস্যা ও দ্বন্দ্বের অবসান করা। এবং একই সাথে প্রয়োজন যেকোন ঘটনার জন্য ভারতকে দায়ী করা কিংবা আওয়ামীবিরোধী প্রচারণা থেকে বিরত থাকা।

অপরের বিবস্ত্র ছবি ছেপে নিজেদের নগ্নতা ঢাকা যায় না

একানব্বই-এর নির্বাচনে আচমকা বিজয় লাভের মাধ্যমে বিএনপি সরকার গঠন করে। সাথে সাথে পাল্টে যায় বিএনপির লড়াকু চরিত্র। আওয়ামী লীগের সাথে একাট্টা হয়ে দীর্ঘদিন বিএনপি এরশাদ বিরোধী আন্দোলন করেছে। রাজপথে মিটিং মিছিল ও লাগাতার হরতালও করেছে দেদার। অবশ্য এরশাদ সরকার জরুরি অবস্থা ঘোষণা করে সংবাদপত্রের উপর কড়া সেন্সরশিপ আরোপ করে। ওই নিষেধাজ্ঞার আওতায় সংবাদপত্রগুলোকে হরতাল লিখতে দেয়া হতো না। তবে সাংবাদিকরা বসে ছিলেন না। নতুন শব্দ রচনা করে তাদের কাজ চালিয়ে যেতেন। হরতালের পরিবর্তে লেখা হত ‘কর্মসূচি’। যেমন- এরশাদ বিরোধী আন্দোলনেরত বিরোধীদল যখন তিনদিন লাগাতার হরতাল ঘোষণা করত তখন সংবাদপত্রে লেখা হতো ‘তিন দিনের কর্মসূচি ঘোষণা করা হয়েছে’। আবার লেখা হত অমুক তারিখ হতে দেশব্যাপী লাগাতার কর্মসূচি ঘোষণা করা হয়েছে। যাইহোক এরশাদের পতন ঘটাতে বাঘে মহিষে যুদ্ধ করতে হয়েছে। গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে যত ধরনের আন্দোলন করা সম্ভব সবকিছুই এস্তেমাল করতে হয়েছে এরশাদের স্বৈরশাসনের অবসান ঘটাতে। এরশাদের পতনের পর আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনার ভাষায় ‘সূক্ষ্ম কারচুপির জোরে’ বিএনপি এক অচিন্ত্যনীয় বিজয় লাভ করে। কিন্তু সরকার গঠনের সাথে সাথে দেশে ডাডাতন্ত্র কায়ম করা হয়। গণতন্ত্র চলে যায় নির্বাসনে। গণমানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে আবার আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে গঠিত হয় সমমনা রাজনৈতিক দল নিয়ে বিরোধীদলীয় জোট। একদিকে গুরু হয় আন্দোলন, অপরদিকে চলতে থাকে গণতান্ত্রিক লেবাসে চরম স্বৈরশাসন। দেশের সাধারণ মানুষের উপর নেমে আসে অত্যাচারের স্টিম রোলার।

এমনি এক বিক্ষোভকালীন পরিবেশে বিরোধীদল আহূত হরতালের সময় শাহবাগ মোড়ে একজন পথচারীকে বিবস্ত্র করা হয়। বিষয়টি অভূতপূর্ব না হলেও সঙ্গত কারণেই আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়েছিল দিন কয়েক আগে। এ জাতীয় ঘটনা শুধু

মেয়ে-স্ত্রী-পরিজন-বন্ধুমহল- চেনাজানা লোকেরা তার বিবস্ত্র ছবিটি দেখেছে। একথা মনে করে উক্ত ব্যক্তিটি নিশ্চয়ই লাজ-লুপ্তিত হয়েছে এবং শ্রিয়মাণ হয়েছে। যদি ব্যক্তিটি সত্যি সত্যিই নির্দোষ ও সহজ-সরল প্রকৃতির হয় এবং যদি সে কোন মহলের পিকড়-আপ না হয় তবে তার মতো হতভাগা দুঃখী ও ব্যথিত মানুষ বাংলাদেশে আর মনে হয় কেউ নেই।

আজ যারা শাহবাগ মোড়ের ভিকটিম লোকটির বিবস্ত্র ছবি রঙিন পোস্টার করে ছাপিয়ে দেশময় বিলি করে বেড়াচ্ছে তারা কী চাচ্ছে? আসলে যারা পোস্টার সাঁটায় নেমেছে তারা চতুর বণিক। তারা ব্যবসায় নেমেছে বিনা পুঁজিতে। তাদের একমাত্র মূলধন শাহবাগ মোড়ের হতভাগ্য মানুষটি ও তার লজ্জা, দুঃখ ও ক্ষোভ। মানুষের দুঃখ নিয়ে, লজ্জা নিয়ে যারা ব্যবসা করে, রাজনীতি করে, তারা শৌর্য-বীর্যশালী নয়। তারা কাপুরুষ।

গায়ের জোরে যারা যত বড় কথাই বলুক এদেশের জনগণই বড় বিচারক। যারা একজন নিরীহ মানুষকে বিবস্ত্র করতে পারে, জনতার আদালতে তাদের একদিন দাঁড়াতেই হবে। জনগণের সুকঠিন সওয়ালের জবাব তাদের দিতেই হবে। কোন অন্যায়ই গণআদালতের কঠিন প্রাচীর ভেদ করে বেরিয়ে যেতে পারবে না। যারা কষ্টার্জিত গণতন্ত্র নিয়ে ছিনিমিনি খেলছে, ঘৃণ্য দলীয়করণ নীতির হিংস্র ছোবলে সকল গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান একের পর এক ধ্বংস করে চলছে, সার চাইতে গেলে কৃষকদের বুকে গুলি চালাচ্ছে, বিশ টাকা চাল আর পঞ্চাশ টাকা সেরে ডাল দিয়ে মানুষের ডাল-ভাত খাওয়ার স্বপ্ন দিচ্ছে চুরমার করে, প্রেসক্লাবে ঝাঁপিয়ে পড়ে দেড় শতাধিক সাংবাদিককে লাঞ্ছিতকারীদের তিরস্কারের পরিবর্তে পুরস্কৃত করে, দিনাজপুরের হতভাগ্য ইয়াসমিনের ধর্ষণ ও হত্যার অপরাধের বিচার প্রার্থীদের যারা দুষ্টকারী বলে আখ্যায়িত করে, ভোটের নামে করে ডাকাতি, শিক্ষার পরিবর্তে মদদ যোগায় সন্ত্রাসবাদের। তাদের সকলকে একদিন জনগণের কাঠগড়ায় আসামি হয়ে দাঁড়াতে হবে। সেদিন যদি গণআদালতে পার পেতে হয় তবে নিজেদের ভূমিকা বদল করতে হবে। অপরের দোষ দেখিয়ে নিজেদের ব্যর্থতা ঢাকা যাবে না। গণআদালতের দুর্ভেদ্য বেষ্টনী পার হতে চাইলে সকলকে আবেগ ও অহমিকা বর্জন করতে হবে। আত্মসমর্পণ করতে হবে ন্যায্য-নীতিবোধ ও বুদ্ধিবৃত্তির কাছে। উলঙ্গ মানুষের ছবি ছাপিয়ে নিজেদের নগ্নতা ঢাকা যাবে না। এটা সংশ্লিষ্ট মহল যত তাড়াতাড়ি বুঝতে পারবে তাদের জন্য ততই মঙ্গলকর। জাতির জন্যও এটা হবে অধিকতর কল্যাণকর ও কাজিফত।

পদ তাঁকে ছেড়ে যাওয়ার আগেই তিনি পদত্যাগ করলেন

হিয়ানব্বই-এর বিস্কোরনুখ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস। আন্দোলনরত ছাত্র-ছাত্রীদের পদভরে প্রকম্পিত বিশ্ববিদ্যালয় চত্বর। উপাচার্য অধ্যাপক ড. এমাজউদ্দিন আহমদ গত ২৪ আগস্ট পদত্যাগ করেন। ৩১ আগস্ট নব নিযুক্ত ভাইস চ্যান্সেলর অধ্যাপক শহীদ উদ্দিন আহম্মদকে তিনি দায়িত্ব বুঝিয়ে দেন। “বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন-শৃঙ্খলা ও পরিবেশ পরিস্থিতির অবনতি ঘটা ও পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে” অভিযোগ এনে মান্যবর উপাচার্য মহোদয় দেশের সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠ থেকে পদত্যাগ করলেন। দায়িত্ব ছেড়ে দেয়ার প্রাক্কালে উপস্থিত সাংবাদিকদের আক্ষেপ করে তিনি বলেছেন, ‘আমি আর পারছি না।’

আসলে কোন প্রতিষ্ঠানে যদি এমন পরিস্থিতির সৃষ্টি হয় যেখানে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের জানমালের নিরাপত্তা বিপর্যয়ের সম্মুখীন এবং পরিস্থিতি প্রতিষ্ঠান প্রধানের আয়ত্তের বাইরে তখন প্রতিষ্ঠান প্রধানের পদত্যাগ করা নিঃসন্দেহে একটি প্রশংসনীয় পদক্ষেপ। গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ, প্রাতিষ্ঠানিক স্বচ্ছতা এবং জবাবদিহিতার প্রতি যারা সজাগ ও শ্রদ্ধাশীল তারা সবসময়ই সকল প্রকার গ্লানি ও ব্যর্থতার দায়দায়িত্ব নিজের কাঁধে তুলে নিয়ে পদত্যাগ করেন প্রতিষ্ঠানের সুনাম, সুখ্যাতি ও ভাবমূর্তি রক্ষাকল্পে। এমনকি অনেক মন্ত্রী, প্রধানমন্ত্রীও নিজ নিজ দপ্তর ও সরকারের ব্যর্থতাকে নিজ কাঁধে নিয়ে পদত্যাগ করে বরণীয় হয়েছেন এমন অসংখ্য নজিরও আমাদের সামনে রয়েছে। সেই দৃষ্টিকোণ থেকে যদি ভাবা যেত, বিশ্লেষণ করা যেত তবে ভিসি মহোদয়ের পদত্যাগ নিঃসন্দেহে একটি প্রশংসনীয় কাজ হিসেবে বিবেচনার দাবি রাখত। কিন্তু না, ভিসি সাহেবের এই নাটকীয় পদক্ষেপ গণতান্ত্রিক রীতিনীতির প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন প্রসূত নয়। বরং মাননীয় ভিসি মহোদয় সরলতার ছদ্মাবরণে কূটকৌশলের আশ্রয় নিয়েছেন। তার পদত্যাগ নাটকের আড়ালে রয়েছে রাজনীতির এক নগ্ন চাল, চাতুর্যপূর্ণ রাজনীতির খেলা।

মাননীয় উপাচার্য এমাজউদ্দিন আহমদের চার বছরের দায়িত্বকালে বিশ্ববিদ্যালয় ন’জন

অনিয়মটিসহ অন্যান্য অনিয়ম তদন্তে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নির্দেশে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের একটি এক-সদস্যবিশিষ্ট কমিটি গঠন করা হয়। অধ্যাপক এম. জেড. মোস্তফা কর্তৃক প্রণীত চার পৃষ্ঠার রিপোর্টটি শুরু হয় এইভাবে, "There has been allegations of blatant nepotism and gross irregularities in the recent appointment of Associate professors at the ISWR. Complaints were lodged with the Ministry of Education and the Ministry asked the UGC to conduct an inquiry into the matter. Against this backdrop, the present inquiring was undertaken.

এই তদন্ত কমিটি উদ্ঘাটন করেন ভিসি সাহেব তার জামাতাকে নিয়োগ করার নিমিত্তে Associate Professor নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করার দু'বছর তিন মাস পরে সিলেকশন কমিটির সভা আহ্বান করেন। (বিজ্ঞাপনের ছয় মাসের মধ্যে নিয়োগ দেয়ার বিধান রয়েছে) কমিটির রিপোর্টের ভিত্তিতে, "There was inordinate delay in convening the meeting of the selection committee. Two years and three months had elapsed before the selection committee met to consider the applications. Such a state of affairs is simply preposterous. This delay enabled at least one candidate to come closer to satisfying the minimum requirements in respect of experience set for the post" এই at least one candidate" হলেন ভিসি মহোদয়ের সৌভাগ্যবান জামাতা। অন্তত সাত বছরের অভিজ্ঞতা না থাকলে Associate Professor হওয়ার বিধান নেই। তাই বিজ্ঞাপন দেয়ার পর সোয়া দু'বছর অপেক্ষা করতে হয়েছে selection committee সভা ডাকতে।

"As another spin-off of the delay a candidate without a research degree and with only 7 years experience got the same treatment as a Ph. D. candidate with 24 years experiences. Both of them were appointed Associate Professor on the same date with equal pay."

ঘটনার এখানেই শেষ নয়। সিলেকশন কমিটির প্রথম সভায় ভিসি মহোদয় থাকলেন না এই বলে যে, এখানে তার জামাতা একজন প্রার্থী। তার অনুপস্থিতিতে অধ্যাপক কে. টি হোসেনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সিলেকশন কমিটির সভায় পাঁচজনকে মনোনীত করলেন। দুর্ভাগ্যজনক এই যে, ভিসি জামাতা বাদ পড়লেন সিলেকশন থেকে। তাই ISWR- এর Board of governors (যার চেয়ারম্যান স্বয়ং ভিসি) এই পুরো সিলেকশন অনুমোদনে অস্বীকৃতি জানালেন এবং বিষয়টি পুনর্বিবেচনা করার জন্য সিলেকশন কমিটিতে ফেরত পাঠালেন। এবার ঘটল দু'টি মজার ঘটনা। ভিসি সাহেব সিলেকশন কমিটির বৈঠকে উপস্থিত থাকলেন। কিন্তু প্রথম সভার সভাপতি অধ্যাপক কে. টি. হোসেন সভায় রইলেন অনুপস্থিত।

এই সভায় মাত্র তিনটি Advertised Posts-এর বিপরীতে মোট সাতজন প্রার্থীর

সকলকেই (ভিসি-র জামাতাসহ) গণ-প্রমোশন দেয়া হল। তদন্ত কমিটিকে বলা হয়েছে- "It may be pointed out in this context that all the candidates with the lone exception of Mr. Atiqur Rahman appeared for interview. He did not ask for an exception for this purpose, nor is it usual to grant such an exception."

ভাইস চ্যান্সেলর-এর সভায় উপস্থিতি সম্পর্কে UGC-র তদন্ত রিপোর্টে বলা হয়েছে, "The Vice-chancellor attended the second meeting of the SC held on 15-11-93. This meeting lasted 5 hours and it is reported that the V.C. was in the meeting all throughout. He guided the deliberations and dictated the decisions of the committee. However, mysteriously enough, the V.Cs name does not appear in the proceeding of the meeting."

এটা আজ পরিষ্কার উপাচার্য মহোদয়ের ২৪ আগস্টের পদত্যাগ বিবেকতাড়িত নয়, রাজনীতিত্যাড়িত আত্মীয়করণ। কোন প্রকার রাজনীতি, শিষ্টাচার কিংবা শোভনতা থেকে এমাজউদ্দিন সাহেব পদত্যাগ করেননি, তিনি ইস্তফা দিয়েছেন নিজের অতীত কর্মকাণ্ডকে আড়াল করতে।

ভাইস-চ্যান্সেলর মহোদয় পদত্যাগ করে পদকে বাঁচালেন। ২৬ আগস্ট বিশ্ববিদ্যালয়ে ক'টি তাজা প্রাণ ঝরে পড়েছিল? কত রক্তে রঞ্জিত হয়েছিল কার্জন হল কিংবা কলাভবনের মুখরিত প্রাঙ্গণ? কী ভয়াবহ পরিস্থিতির ভূত দেখলেন ভিসি মহোদয়, যার জন্য নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গিয়েছিল? একমাত্র পুনর্বীর ভিসি নির্বাচিত হওয়ার বিষয়টি ছাড়া বাকি সবকিছুই তো ছিল আপনার পূর্ণনিয়ন্ত্রণে। বিরাজমান পরিস্থিতিতে আপনাকে তো কষ্ট করে পদত্যাগ করতে হত না। সময় এসেছিল পদই আপনাকে ছেড়ে যেত।

গোলাম আযমের পদত্যাগ না ভিন্নতর কূটকৌশল?

গোলাম আযম পদত্যাগ করেছেন। একাত্তরের যুদ্ধাপরাধী এই গোলামের পরিচয় দেয়ার প্রয়োজন নেই। গত প্রায় দুই দশক তিনি জামায়াতে ইসলামীর নেতৃত্বে ছিলেন। কখনও প্রকাশ্যে আবার কখনও বা পর্দার আড়ালে। তার পদত্যাগ জাতীয় জীবনে কোন গুরুত্ব বহন করে না। কিন্তু যে নাটক সৃষ্টি করা হয়েছে তা অনেকেরই দৃষ্টি কেড়েছে। এক বিবৃতিতে তিনি পদত্যাগের দাবি করলেও পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত খবর থেকে জানা যায় তাকে মূলত পদচ্যুত করা হয়েছে। ঘটনা যাই হোক আসল সত্য হচ্ছে তিনি আর জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের আমীর নন। এটা ইতিহাসের স্বাভাবিক পরিণতি। তার বিরুদ্ধে দল ও জোটের মধ্যে পুঞ্জীভূত ক্ষোভ ও হতাশা আঁচ করে চতুর গোলাম আযম এই ত্বরিত সিদ্ধান্ত নেন। তাই স্বাস্থ্যগত কিংবা বার্ষিক্যজনিত কারণে পদত্যাগ করেছেন বলে যে দাবি করা হয়েছে তাকে রাজনৈতিক ধাপ্লাবাজি ছাড়া আর কিছু বলা যায় না।

এমন সময় তিনি পদত্যাগ করলেন যখন বলা হচ্ছে, বিএনপি-জাপার সঙ্গে একাট্টা হয়ে আওয়ামী লীগ সরকারকে কুপোকাৎ করার চূড়ান্ত মুহূর্ত সমাগত এবং জোট নেতৃত্ব আর মাত্র ‘একটি ধাক্কার’ পরই ক্ষমতার মসনদে পৌঁছে যাবে। তাহলে কেন এই পদত্যাগ? আসলে গোলাম আযমের পদত্যাগের কারণ একটিই এবং তা একেবারেই সরল ও স্বাভাবিক। যোগ-বিয়োগ-গুণ-ভাগ-লসাগু-গসাণ্ড যাই করুন না কেন দেখা যাবে এর পেছনে একটি রাজনৈতিক চালবাজিই বিদ্যমান। আর তা হল পাকিস্তানী হানাদার বাহিনীর দোসর, এ দেশের অগণিত মানুষ হত্যা, লাখ লাখ মা-বোনের ইজ্জত লুণ্ঠন, অগ্নিসংযোগ, লুটপাট, এক কোটি মানুষকে বাস্তবভিটা থেকে উৎখাতের অপবাদ এবং স্বাধীনতার শত্রু ও যুদ্ধাপরাধী হিসাবে চার দলীয় জোটের যে পরিচিতি আজ স্পষ্ট হয়ে

উঠেছে তার কলঙ্ক-কালিমা কিছুটা হলেও মুছে ফেলার জন্যই এই সাজানো পদত্যাগ নাটকের অবতারণা করা হয়েছে। এর প্রমাণ অসুস্থতার কারণ দেখিয়ে পদত্যাগের মাত্র ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই গোলাম আযম ঘোষণা দিয়েছেন, ‘দলীয় প্রধানের পদ থেকে ইস্তফা দিলেও জামায়াত ছাড়িনি, রাজনীতিও ছাড়িনি।’ তাহলে তিনি ছাড়লেনটা কী? ছাড়লেন চার দলীয় জোটের শীর্ষ নেতৃত্ব, ছাড়লেন জোটের মঞ্চ। কারণ একই মঞ্চে খালেদা জিয়ার পাশে তাকে আসন নিতে দেখে কেবল স্বাধীনতাপ্রিয় দেশবাসীই ক্ষুব্ধ হয়নি বরং খোদ বিএনপি ও জাপার বৃহত্তর অংশ ঘৃণায় ফেটে পড়েছে। বিশেষ করে গোলাম আযমকে নিয়ে গঠিত বিরোধী জোটের প্রেক্ষাপটে স্বাধীনতাকামী ও মুক্তিযুদ্ধের চিন্তা-চেতনায় বিশ্বাসী আপামর জনগণ ‘মুক্তিযোদ্ধা-জনতা’ ব্যানারে যেভাবে ঐক্যবদ্ধ হয়ে হুঙ্কার ছাড়ে তাতে জোট নেতৃত্ব ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে আত্মরক্ষার তাগিদেই জোটকে গোলাম আযমমুক্ত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। শেষ পর্যন্ত গোপন নীল-নকশা ঐকে কেবল নির্বাচন পর্যন্ত গোলাম আযমকে চার দলীয় মঞ্চ থেকে দূরে রাখার কৌশল হিসাবে তারা তাকে পদত্যাগের ঘোষণা দিতে বাধ্য করেন। নির্বাচনে সুফল পাওয়া গেলে গোলাম আযম আবার তসরিফ আনবেন, উজির হবেন এবং বাংলাদেশকে পাকিস্তান বানাবেন।

তবে গোলাম আযমকে সাময়িকভাবে মঞ্চ থেকে দূরে এবং একই সঙ্গে জামায়াতকে অন্যতম শরিক দল রেখে বিএনপি নেতৃত্বাধীন জোট নিজেদেরকে মুক্তিযুদ্ধের বিরোধী নয় বলে প্রচারণা চালিয়ে কতটুকু সফল হবে সেটাই এখন দেখার বিষয়। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, গোলাম আযমের আসনে কাকে বসিয়ে জোট জনগণকে খুশি করবেন। নিজামী সাহেবকে না অন্য কাউকে? জামায়াতের মধ্য থেকে গোলাম আযমকে আড়াল করে ক্লিন মুখ খোঁজার বিরোধী দলীয় এই প্রয়াস কেবল হাস্যকরই নয় প্রতারণা ও চাতুর্যপূর্ণও বটে।

তবে আসল কথা গোলাম আযম কেবল জামায়াত কিংবা চার দলীয় ঐক্যজোটের জন্যই আপদ নয়। গোটা জাতির কলঙ্ক। জাতিকে এই ঘোরকলঙ্ক থেকে মুক্ত করতে হলে অবিলম্বে যুদ্ধাপরাধী হিসাবে গোলাম আযমের বিচার হওয়া উচিত, তাকে ফাঁসিতে লটকানো উচিত।

বাংলাদেশ বার কাউন্সিল আয়োজিত মানবাধিকার সংক্রান্ত এক সেমিনারে সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি ও আইনজীবীগণ ছাড়াও দেশ-বিদেশ থেকে আগত আইন বিশেষজ্ঞ ও মানবতাবাদী আন্দোলনের নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। সেমিনারের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ভাষণ দিতে গিয়ে বার কাউন্সিলের সাবেক সভাপতি ও এটর্নি জেনারেল প্রয়াত আমিনুল

হক বলেছিলেন, 'In this part of land there was never any violation of state organized human rights unless and untill President Yahya Khan denied to hand-over power to the elected representatives of the people' (নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরে ইয়াহিয়া খানের অস্বীকৃতির পূর্ব মুহূর্তে এ দেশে কোন সংগঠিত রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস হয়নি)। আবেগাপ্ত কণ্ঠে আমিনুল হক আরও বলেছিলেন, নির্বাচিত প্রতিনিধিদের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করার পরিবর্তে ইয়াহিয়া চক্র এদেশে নজিরবিহীন ও বিভীষিকাময় গণহত্যা চালিয়েছে। একই সঙ্গে চলেছে হানাদার বাহিনীর অগ্নিসংযোগ, লুণ্ঠন ও মা-বোনদের পবিত্র সস্ত্রম লুণ্ঠন।

দুঃখ করে আমিনুল হক বলেছিলেন, 'জাতির এই চরম দুঃসময়ে এদেশেরই কিছু কুলাঙ্গার ও দেশদ্রোহী অতি উৎফুল্ল ও সানন্দচিত্তে পাক-হানাদার বাহিনীকে সহায়তা করেছিলেন হত্যা, লুণ্ঠন ও নারী ধর্ষণে। এরপর কিছুক্ষণ নির্বাক হয়ে রইলেন। তার দু'চোখ ছলছল করে উঠল। অত্যন্ত কাছ থেকে দেখলাম, আপোষহীন মানবতাবাদী এই শীর্ণকায় মানুষটি হঠাৎ সুবিশাল পর্বতের মতো মাথা উঁচু করে শাহাদাত আঙুল হেলিয়ে আমাদের শ্বেত-গুহ্র সুপ্রিম কোর্ট ভবনটির প্রতি ইঙ্গিত করে দৃঢ়চিত্তে উচ্চারণ করলেন, "Our this court is so generous that is had accomodated a war criminal by giving verdict" (আমাদের আদালত এতই উদার যে, একজন যুদ্ধ অপরাধীর পক্ষে রায় দিয়ে তাকে সমাজে পুনর্বাসিত করেছে)। উত্তেজনায়, ক্ষোভ ও ঘৃণায় আমিনুল হক কাঁপছিলেন। তিনি কথাগুলো বলেছিলেন জঘন্য যুদ্ধাপরাধী গোলাম আযমকে ইঙ্গিত করে। দীর্ঘদিন অমানুষিক পরিশ্রম করেছেন আমিনুল হক। কিন্তু সুপ্রিম কোর্টের ও আইনের ফাঁক-ফোকর গলে গোলাম আযম বের হয়ে এসেছে। এর পর বছরের পর বছর অতিক্রান্ত হয়েছে। সুপ্রিম কোর্ট থেকে খালাস পেলেও গোলাম আযম জনতার আদালত থেকে মুক্তি পায়নি। ঐতিহাসিক সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে অনুষ্ঠিত গণআদালতের বিচারে যুদ্ধাপরাধী গোলাম আযমকে ফাঁসি দেয়া হয়েছিল। তাছাড়া বাংলার স্বাধীনতা ও গণতন্ত্র পাগল মানুষের ঘৃণা ও রোষাণল থেকে গোলাম আযম কখনও নিস্তার পায়নি। দলীয় প্রধানের পদ থেকে অপসারিত হল, জনতার আদালতই সবচেয়ে বড়। জনতার বিচার সর্বোচ্চ এবং একই সঙ্গে প্রমাণিত হল, দেশের বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর চিন্তা-চেতনার সঙ্গে সম্পর্কহীন, মিলনহীন কোনও কিছু কিংবা কোনও মানুষই টিকতে পারে না।

জনগণ প্রকাশ্যে আগুন ছড়িয়ে দিয়েছে এই কুখ্যাত ও গণধিকৃত ব্যক্তিটির মঞ্চে

সঞ্চর হয়েছে।

দেশের মহান স্বাধীনতা যুদ্ধের বিরোধিতা করার অপরাধে গোলাম আযমের নাগরিকত্ব বাতিল ঘোষণা করেছিল জাতির জনকের নেতৃত্বাধীন সরকার। ১৯৭৫ সালে ১৫ আগস্টের কালো রাতে জাতির জনককে সপরিবারে নির্মমভাবে হত্যার পূর্ব পর্যন্ত গোলাম আযম পাকিস্তানে ছিলেন এবং মুসলিম বিশ্ব তথা সারাবিশ্বে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের বিরুদ্ধে শুধু বিষোদগার করেই ক্ষান্ত হননি, সদ্য স্বাধীন দেশটির স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব বিনষ্ট করার সক্রিয় চক্রান্তে জড়িত ছিলেন। বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করে ক্ষমতা কুক্ষিগত করার পর মুক্তিযোদ্ধা নামধারী জিয়াউর রহমান তার পাক-প্রভুদের খুশি করার জন্য গোলাম আযমকে বাংলাদেশে ফিরিয়ে আনেন এবং খালেদা জিয়ার শাসনামলে লোক দেখানো একটি মামলার মধ্য দিয়ে গোলাম আযমকে বাংলাদেশের নাগরিকত্ব প্রদান করে রাজনীতিতে পুনর্বাসিত করেন। অবশ্য, এটা ছিল বেগম জিয়ার কৃতজ্ঞতাবোধের পরিচায়ক একটি মনোরম দৃষ্টান্ত। '৯১-এর জাতীয় নির্বাচনে 'সূক্ষ' কারচুপির মাধ্যমে এবং নিজেদের নাক কেটে আওয়ামী লীগকে পরাজিত করে বিএনপিকে জিতিয়ে দেয়ার ইনামস্বরূপ খালেদা জিয়া গোলাম আযমের নাগরিকত্ব প্রদান করেন। অনেক রাজনৈতিক উত্থান-পতনের মধ্য দিয়ে শেষতক বিএনপি এবং জাতীয় পার্টি উভয়েই যখন নিজেদের 'কুতুর বল' দিয়ে আওয়ামী লীগকে হটানো যাবে না বলে আত্মোপলব্ধি করতে সক্ষম হয় তখনই এই 'রগ কাটা', 'কল্লাকাটা' পার্টিকে সহোদর বানিয়ে একই মঞ্চে এনে বিনেসূতোয় গাঁথা মালার মতো একে অপরের সঙ্গে সুশোভিত হতে থাকে। কিন্তু শেষ রক্ষা হয়নি। গোলাম আযমের গা থেকে যে সুগন্ধি বেরুতে থাকে মুখে রুমাল গুঁজেও বেগম খালেদা জিয়া তা ঠেকাতে পারেননি। গোলাম আযমের আপাদমস্তক জুড়ে যে কলঙ্কের ছাপ লেগে রয়েছে জাতির সামনে তা জ্বলজ্বল করছে। জঘন্য এই বিকৃত চেহারা লুকানো কৌশল হিসাবেই গোলাম আযমের পদত্যাগ নাটক। আসলে নেপথ্যে গোলাম আযমই জামাতের নেতা, প্রভু। এই সত্যটি জনগণের কাছে দিবালোকের মতো পরিষ্কার।

গোলাম আযম যতই পদত্যাগ করুক তাতে তার কৃতকর্মের পাপস্থলন হওয়ার নয়। সে ক্ষমতার অযোগ্য, তার কু-কর্মের জন্য তাকে জনতার কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হবেই। আজ আমাদের মাঝে শহীদ জননী জাহানারা ইমাম আর বেঁচে নেই। এই জননী সাহসিকা গোটা জাতিকে উজ্জীবিত করে গেছেন ঘাতক গোলাম আযমের বিচারের দাবিতে। ঐতিহাসিক সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে তারই নেতৃত্বে অনুষ্ঠিত হয়েছে গোলাম আযমের

বিচার। জনতার আদালতে তাকে প্রকাশ্যে এবং ফাঁসিতে লটকিয়ে হত্যার রায় দেয়া হয়েছে। গণআদালতের সেই রায় কার্যকর করার দাবির সমর্থনে যখন তিনি দেশব্যাপী তীব্র গণজোয়ার সৃষ্টি করেছিলেন তখন এই গণরায়কে শ্রদ্ধা করার পরিবর্তে খালেদা জিয়ার সরকার উল্টো শহীদ জননীর বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহিতার মামলা রুজু করে। এই রাষ্ট্রদ্রোহিতার মামলা কাঁধে নিয়েই শহীদ জননীকে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করতে হয়েছে। গণমানুষের আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে খালেদা জিয়ার সরকার যে ধৃষ্টতা প্রদর্শন করেছেন তার সঠিক জবাবও জনগণ দিয়ে দিয়েছে ১৯৯৬-এর ১২ জুনে। আবারও জনতা প্রমাণ করেছে জনগণই সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী। আশার কথা, কুয়েত থেকে দেশে ফিরে সাংবাদিক সম্মেলনে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ঘোষণা দিয়েছেন, যুদ্ধাপরাধী হিসাবে গোলাম আযমের বিচার করা হবে। জাতি আজ সেই দিনের প্রত্যাশায় অপেক্ষা করছে-যেদিন তার দেহ ফাঁসির রজ্জুতে বুলবে।

আমাদের রাজনীতিতে কুড়াল ও গামছা তত্ত্ব

১৯৯৬ সাল। ১৫ ফেব্রুয়ারির সাধারণ নির্বাচনের তোড়জোড় চলছে। চট্টগ্রাম থেকে বাসে চড়ে সন্ধ্যায় টিকাটুলির মোড়ে নামলাম। এরপর রিকশায় পুরানা পল্টনে বাসস অফিসের দিকে রওনা হই। দৈনিক বাংলার মোড়ে একটি নির্বাচনী প্রচারণার তেলসমাতি দেখে রিকশা স্লো করে দাঁড়িয়ে পড়লাম। বাম্পে সুন্দরভাবে রাখা বঙ্গবন্ধুর বড় একটি পোর্ট্রেট। বৈদ্যুতিক কারুকার্যের সাহায্যে এমনভাবে তা প্রতিস্থাপন করা হয়েছে যে, চরকার ঘূর্ণির মতো লাল, নীল, হলুদ, বেগুনি সবুজ প্রভৃতি রং এসে রংধনুর মতো বঙ্গবন্ধুর কণ্ঠকে স্পর্শ করছে আবার মিলিয়ে যাচ্ছে। কিছুটা ভ্রমের কারণে দৃশ্যটি প্রথমে আমার চিত্তচাঞ্চল্য ঘটায়। মুহূর্তেই আমি আঁতকে উঠি। লক্ষ করলাম, বৈদ্যুতিক তেলসমাতি এমনভাবে প্রতিস্থাপন করা হয়েছে যে, প্রতিটি রং বদলানোর পালায় বঙ্গবন্ধুর কণ্ঠকে শুধু রঙিন ছায়াই স্পর্শ করে যাচ্ছেন, একই সাথে একটি কুড়াল এসে এমন নির্দয়ভাবে বিম্বিত হচ্ছে যাতে, মনে হচ্ছে কোন সর্বনাশা ঘাতকচক্র অনবরত বঙ্গবন্ধুকে কুপিয়ে দেহ থেকে মাথা বিচ্ছিন্ন করে ফেলছে। মাথা জোড়া লাগছে এবং আবার তা বিচ্ছিন্ন হচ্ছে। এটা চলছে পৈশাচিক গতিতে অনবরত ঘড়ির কাঁটার দোলার মতো।

একটু মনোযোগ দেয়ার পরই আমার কাছে গোটা বিষয়টি পরিষ্কার হয়ে গেলো। এই রং-বেরঙের বৈদ্যুতিক তেলসমাতিটি আসলে ফ্রিডম পার্টির নির্বাচনী প্রচার কৌশল। বঙ্গবন্ধুর আত্মস্বীকৃত খুনিরা পরবর্তীতে রাষ্ট্রক্ষমতা দখলকারীদের পৃষ্ঠপোষকতায় রাজনৈতিক দল পর্যন্ত গঠন করেছিল। সেই দলের নাম ছিল ফ্রিডম পার্টি এবং তাদের নির্বাচনী প্রতীক ছিল কুড়াল। তাদের মানব-সভ্যতা বিরোধী বর্বর কর্মকাণ্ড ও পৈশাচিক চরিত্রের সাথে কি বেপরোয়া মিল তাদের নির্বাচনী প্রতীকের। জাতির জনককে হত্যা করেও তাদের রক্ত পিপাসা মেটেনি। তাই সেই লোলুপ রক্ত পিপাসুরা বঙ্গবন্ধুর ছবি লাগিয়ে অনবরত গলায় কুড়াল মেরে কি পৈশাচিক উল্লাস উপভোগ করতো। দৈনিক

বঙ্গবীর কাদের সিদ্দিকী এ কথা খোলাসা করে না বললেও নির্বাচনী প্রতীক নির্ধারণ ও তা বরাদ্দের জন্য পীড়াপীড়ি এবং ব্যবহারের ধারণ-ধরন দেখে বুঝতে অসুবিধা হয়নি যে, আসলে তিনি চেয়েছিলেন আওয়ামী লীগের গলায় গামছা লাগাতে। স্বপ্ন দেখেছিলেন, গলায় গামছা বেঁধে সখিপুর-বাসাইলের জনগণের সামনে দিয়ে টেনে-হেঁচড়ে নিয়ে যাবেন তার রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে। তাই প্রতীক হিসাবে গামছা না পেলেও নির্বাচনের শেষ লগ্নিটি পর্যন্ত তিনি এবং তাঁর সমর্থকরা মাথায় গামছা বেঁধে যুদ্ধংদেহী হাবভাব প্রদর্শন করেছেন।

শুধু তাই নয়, আওয়ামী লীগ থেকে বহিষ্কার হবার পর তিনি কথায় কথায় ন্যায়নীতি, আদর্শ, বিবেক, সততা প্রভৃতি বিষয়ে আওয়ামী লীগকে উপদেশ দিয়ে চলেছেন। আজ যদি কেউ প্রশ্ন তোলেন ন্যায়নীতির যাদুস্পর্শে উজ্জীবিত সিদ্দিকী সাহেব ভোটগ্রহণকালে নির্বাচন কেন্দ্রের মধ্যে কোন্ আইনের প্রতি শ্রদ্ধা দেখিয়ে দলবল সমেত লাঠিসোটা নিয়ে ঢুকে পড়লেন! কেবল সমাবেশ করেই ক্ষান্ত হননি, তিনি কেন্দ্রে কেন্দ্রে গিয়ে লাঠিসোটা দিয়ে নির্বাচন স্থগিত করার জন্য বল প্রয়োগও করেছেন। তিনি আইনের কথা বলতে গিয়ে মুখে ফুলঝুড়ি ফুটাবেন, তবে নিজে আইন মানবেন না। সালিশ মানি তবে তালগাছটা আমার। জনগণই সবচেয়ে বড় বিচারক। সংবিধানের সপ্তম অনুচ্ছেদে তাই আমাদের মেধাবী সংবিধান প্রণেতাগণ সঠিকভাবেই লিপিবদ্ধ করে গেছেন প্রজাতন্ত্রের মালিক জনগণ। দু'দিন আগেই নিজ নির্বাচনী এলাকায় সমাপনী ভাষণ দিতে গিয়ে বীরদর্পে বিরোক্ত কাদের সিদ্দিকী বলেছেন, দু'একদিনের মধ্যে এই পিঁড়ি আমি শেখ হাসিনার মাথায় ছুড়ে মারব। না, তিনি সে আকাঙ্ক্ষা পূরণ করতে পারলেন না। জনগণ সেই ঈঙ্গিত সুযোগ থেকে তাকে বঞ্চিত করেছে। লাঠিসোটা, কুড়াল, গামছা সবময়ই ফলপ্রসূ হবে কিংবা কাক্ষিত ফল বয়ে আনবে এমনটি নয়। আবেগের সাথে বুদ্ধিবৃত্তির স্পর্শ না থাকলে, বন্য অভিপ্রায়ের সাথে নীতিবোধ না থাকলে তা ফলপ্রসূ হতে পারে না, টিকে থাকতে পারে না। ফ্রিডম পার্টির জজবা সৃষ্টিকারী সেই কুড়াল ও কুড়াল প্রদর্শনের দিনগুলো কখন কিভাবে জাতীয় জীবন থেকে গোপনে লাপাত্তা হয়ে গেছে কেউ খেয়াল করেনি, খেয়াল করার চেষ্টাও করেনি।

গামছার চটকদারীও অতি শিগগিরই কুড়ালের ভাগ্যবরণ করবে এতে সন্দেহ নেই। কুড়াল-গামছা তত্ত্ব রাজনীতিতে বেশি দিন চলতে পারে না। কারণ জনগণ এখন পুরোদমে সজাগ।

পাকিস্তান টিভি'র ধৃষ্টতা ক্ষমার অযোগ্য

অবস্থাদৃষ্টে মনে হয় পাকিস্তানীরা এখনও বাংলাদেশের স্বাধীনতাকে সম্মানের চোখে দেখতে শেখেনি। আমাদের অমূল্য স্বাধীনতার প্রতি সুযোগ পেলেই কটাক্ষ করা কিংবা তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করা পাকিস্তানের স্বভাবে পরিণত হয়েছে। অতীতে অসংখ্যবার এমনটি ঘটেছে এবং সদ্য সমাপ্ত ত্রি-দেশীয় বাণিজ্য শীর্ষ সম্মেলন ও বিপুল উৎসাহ-উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে ঢাকার মাঠে অনুষ্ঠিত স্বাধীনতা কাপ ক্রিকেট টুর্নামেন্টে পাকিস্তানীদের বচন-বাচনে তা আরও প্রকটরূপে ধরা পড়েছে।

গত রবিবার জাতীয় স্টেডিয়ামে স্বাধীনতা কাপ টুর্নামেন্টের শেষ ফাইনাল খেলাটি অনুষ্ঠিত হয় ভারত-পাকিস্তানের মধ্যে। অভূতপূর্ব আকর্ষণীয় ও উত্তেজনাপূর্ণ এই খেলার সংবাদ পরিবেশন করতে গিয়ে পাকিস্তান টেলিভিশন (পিটিভি) রাতের খবরে, অন্তত ছ'বার খেলাটিকে “সিলভার জুবিলি কাপ” বলে উল্লেখ করেছে। একবারও বলা হয়নি স্বাধীনতা কাপ। অথচ কখনও কোথাও এ টুর্নামেন্টকে “সিলভার জুবিলি কাপ” বলে বলা হয়নি। পরিষ্কারভাবে উদ্যোক্তা, দেশী-বিদেশী সকল প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়া গত এক সপ্তাহ ধরে খেলাটিকে “স্বাধীনতা কাপ টুর্নামেন্ট” বলে প্রচার করেছে। পিটিভি'র লোকজন সম্ভবত চোখের মাথাও খেয়ে বসে থাকেনি। যখন পিটিভিতে বলা হচ্ছিল “সিলভার জুবিলি কাপ” তখন ঢাকার মাঠের যে ছবি দেখানো হচ্ছিল তার চতুর্দিকেই দৃশ্যমান “স্বাধীনতা কাপ” কথাটি। অতএব এটা করা হয়েছে ইচ্ছাকৃতভাবে। স্বভাবদোষে। ভাসুরের নাম নিতে মানা। তাই বাংলাদেশের ‘স্বাধীনতা’ এই শব্দটি উচ্চারণ করতেই তাদের এই অনীহা ও গাভ্রদাহ।

অবশ্য বাংলাদেশের স্বাধীনতার কথা উঠলেই পাকিস্তানীদের আঁতকে ওঠার কথা। লজ্জা শরমের বালাই কখনও ওদের ছিল না। ‘মুসলমান-মুসলমান ভাই ভাই’ বলে বাঙালিদের প্রত্যক্ষ সহায়তায় পাকিস্তান হাসিল করেই ওরা ভোল পাল্টিয়ে ‘মুসলমান-মুসলমান ভাই-ভাই- তোমরা চাও আমরা খাই’ বলে ২৪ বছর লুটের রাজত্ব কায়েম করেছিল। পরে যখন জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের নেতৃত্বে বাঙালিরা নিজেদের অধিকার

পাকিস্তানের কাছে বাংলাদেশের বর্তমান পাওনা এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার কোটি টাকা

পাকিস্তানের কারাগার থেকে স্বদেশের মাটিতে ফেরার এক সপ্তাহের মধ্যেই জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব গিয়েছিলেন খুলনায়। সেখানে এক জনসভায় ভাষণ দিতে গিয়ে বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন, বিদায় জানানোর সময় জুলফিকার আলী ভুট্টো তাঁর হাত ধরে বলেছিলেন, “মুজিব ভাই, এক সঙ্গেইতো ছিলাম। দেশে ফিরে গিয়ে একটু চিন্তা করে দেখবেন কোন প্রকার সম্পর্ক রাখা যায় কিনা” আবেগ আপ্ত কণ্ঠে বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন, “কি সম্পর্ক রাখবেন ভুট্টো সাহেব। দেখে যান আপনার বর্বর বাহিনী কি নির্মম হত্যাযজ্ঞ চালিয়েছে আমার মানুষের উপর। কি পাশবিক নির্যাতনের শিকার হয়েছে আমার নিষ্পাপ মা-বোনেরা।”

বঙ্গবন্ধুর এই আক্ষেপের মাঝেই নিহিত ছিল বাংলাদেশ-পাকিস্তানের সম্পর্কোন্নয়নবিষয়ক অন্তর্নিহিত ম্যাসেজটি। পাকিস্তান যদি গণহত্যা ও নারী নির্যাতন চালানোর দায় স্বীকার করে লাজলুপ্তিত-অবগুপ্তিত চিত্তে নিঃশর্ত ক্ষমা চাইত বাংলাদেশের মানুষের কাছে তাহলে হয়তো কোমল উদার হৃদয়ের অধিকারী বাঙালিরা মহত্ত্ব দিয়ে, উদারতা দিয়ে পাকিস্তানীদের ক্ষমা করতেও পারত এবং কেবল তখনই দু’দেশের মাঝে সম্পর্ক উন্নয়নের অন্যান্য বিষয়গুলো বিবেচনায় আনা যেত। শুধু মাফ চাওয়াই নয় তিরিশ লক্ষ শহীদের রক্তের দাম আর পাকহানাদার বাহিনীর সৃষ্ট কু-কর্মের জরিমানা ছাড়াও পাকিস্তানের কাছে বাংলাদেশের প্রাপ্য সম্পদের পরিমাণ এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার কোটি টাকা। এসবের হিসাব-নিকাশ না করে, দেনা-পাওনা মিটিয়ে না দিয়ে সম্পর্ক উন্নয়ন কি সম্ভব? অবশ্য মহল বিশেষের কথা আলাদা। পাকিস্তান বলতেই যারা অজ্ঞান তাদের কাছে এই মাফ চাওয়ার বিষয়টি একেবারেই গৌণ। মেরেছিস কলসীকানা তাই বলে কি প্রেম দেব না! এহেন মহলের সাথে বাংলাদেশের স্বাধীনতা পাগল মানুষের সম্পর্ক নেই। মিল নেই চিন্তা কিংবা চেতনার।

ঈর্ষাকাতর হয়ে নেওয়াজ শরীফের ‘কাছের লোকরা’ সোনারগাঁও হোটেলের উইন্টার গার্ডেনে গিয়ে শরীফকে বারণ করেছেন এমন কোন সিদ্ধান্ত এ মুহূর্তে না দেয়ার জন্য। বর্তমান প্রেক্ষিতে জাতির প্রত্যাশা পাকিস্তানের শুভবুদ্ধির উদয় হবে এবং সকল প্রকার রাজনৈতিক চোরাগলি থেকে বেরিয়ে এসে সম্পূর্ণ মানবতা ও কর্তব্যবোধ তড়িত হয়ে নিজদের নাগরিকদের ফিরিয়ে নিয়ে বাংলাদেশকে মুক্ত করবে। রাজনীতিতে স্থায়ী শত্রু মিত্র বলে কোন কথা নেই। মানবিক দৃষ্টিকোণ থেকে তো নয়ই। তিক্ত ও মর্মান্তিক অতীত স্মৃতি জীবন্ত থাকা সত্ত্বেও পরস্পরের স্বার্থে বাংলাদেশ ও পাকিস্তানের সম্পর্ক শুধু স্বাভাবিক নয় উন্নত হওয়া দরকার। তবে পাকিস্তান বলতেই যাদের চোখে মারি ও কাশ্মিরের সৌন্দর্য ভেসে ওঠে অথবা আঙ্গুর আর আপেলের রসে জিহ্বা আলুপালু হয়ে উঠে তাদেরকে এই কঠিন সত্যটি বুঝতে হবে, যতদিন পাকিস্তানীরা তাদের কৃতকর্মের অপরাধ করজোরে স্বীকার করে অবনত মস্তকে বাংলাদেশের কাছে শর্তহীন ক্ষমা না চাইবে এবং বাংলাদেশের কৃষক-শ্রমিক-মজুরের রক্তে গড়ে উঠা সম্পদের হিসাব পাই পাই বুঝিয়ে না দেবে ততদিন পর্যন্ত পাকিস্তানের সাথে বাংলাদেশের সম্পর্ক স্বাভাবিক হতে পারে না। পাকিস্তান বাংলাদেশের মানুষের কাছে কেবলই হয়ে থাকবে একান্তরের ঘাতকের প্রতিচ্ছবি।

ব্যর্থ রাষ্ট্র, না ব্যর্থ সরকার

ভারতের জন্মগ্রহণকারী ইংরেজ কবি রুডিয়ार्ড কিপলিং লিখেছেন- ‘Many Nations have come and perished and left no traces. History gives very nakedly one single and simple reason for all cases. They failed because there people were not fit.’ কবির এ চিরন্তন বাণী একটি প্রমাণিত সত্য। দেশ বা রাষ্ট্র কি ছার। সভ্যতা পর্যন্ত বিলীন হয়ে যায় যখন সংশ্লিষ্ট জনগোষ্ঠী যোগ্যতা হারিয়ে ফেলে। আমাদের এ ভূ-খণ্ডেই তো কত রকম সভ্যতার জন্ম হয়েছিল, যার অস্তিত্ব আজ কেবল ইতিহাসের পাতাতেই সীমাবদ্ধ। আর্য, অনার্য, শক, হুন, দ্রাবিড় মঙ্গলীয়, পাঠান, মোগল কত ধরনের সভ্যতারই উত্তরসূরি আমরা; কিন্তু বর্তমানে সব সভ্যতা বিলীন হওয়ার পর আমরা ইংরেজদের সুদীর্ঘ পদানত হওয়ার পর পাঞ্জাবি, মাড়ওয়ারি শোষণের যাঁতাকলে নিষ্পেষিত এক ক্ষুদ্র জনপদ ছাড়া অন্য কী পরিচয় আমাদের অবশিষ্ট আছে?

একশ্রেণীর রাজনীতিক বক্তৃতাবাজ ও বিশেষ খোলসের একশ্রেণীর সেমিনার শিল্পীদের মুখে প্রায়ই একটি বক্তব্য শোনা যায়, এ দেশ টিকে থাকবে। কেউ আমাদের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব কেড়ে নিতে পারবে না। আসলে এমন বক্তব্য কেবল আবেগপ্রবণ উচ্ছ্বাস। এর মধ্যে না আছে যুক্তি-তর্ক, না আছে বাস্তবতার বিন্দুমাত্র উপস্থিতি। আমরা কারা? এই সেদিনেও তো আমরা ছিলাম পাকিস্তানী, আমাদের দেশ ছিল প্রিয় পাকিস্তান। মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ মাত্র সে দিন বীরদর্পে ঘোষণা দিয়েছিলেন Pakistan has come to stay ‘জিন্নাহ মিয়ান পাকিস্তান, আজিমপুরের গোরস্তান’- এ স্লোগান দিয়ে আমরা প্রিয় দেশকে পাঞ্জাবি দখল মুক্ত করে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ বানিয়েছি। বাংলাদেশের লোকদের বলা হতো পূর্ব পাকিস্তানী। বর্তমানে বীরবাঙালি। অতএব আমাদের চোখের সামনেই প্রমাণিত হয়েছে রুডিয়ार्ড কিপলিংয়ের বাণীর সত্যতা।

যোগ্যতা হারিয়ে ফেললে জাতির বা দেশের কোনো অস্তিত্ব থাকে না। পাকিস্তানের রাষ্ট্র পরিচালনায় পাঞ্জাবি শাসকগোষ্ঠীর অদূরদর্শী ও অপরিণামদর্শী দৃষ্টিভঙ্গির জন্য জিন্মাহর দেশটি আজ মরহুম পাকিস্তানে পরিণত হয়েছে।

রুডিয়র্ড কিপলিংয়ের সতর্ক বাণীকে সামনে রেখে আজ আমাদের জাতীয় জীবনও এমনি একটি কঠিন কঠোর বাস্তবতা এসে উপস্থিত হয়েছে। বাংলাদেশ ব্যর্থ রাষ্ট্র বাংলাদেশে এমন একটি বক্তব্য নিয়ে এর পক্ষে-বিপক্ষে বাদানুবাদ শুরু হয়েছে। কেবল দেশেই নয়, বিদেশী প্রভাবশালী মিডিয়াতেও এ একই সুর ধ্বনিত হচ্ছে। বিষয়টিকে হাক্কাভাবে কিংবা কেবল আবেগপ্রসূত চিন্তা-ভাবনার মধ্যে সীমারেখা টানার কোনো অবকাশ নেই। এর মধ্যে এ দেশের ১৪ কোটি মানুষের বাঁচা-মরার ও মানসম্মানের প্রশ্ন জড়িত। এর সঙ্গে সম্পৃক্ত রয়েছে আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধেও চেতনা ও লাখো মানুষের আত্মদানের মাধ্যমে গড়ে ওঠা ইতিহাসের টিকে থাকার বিষয়টি। স্যার এডমন্ড বার্কের সে অগ্নিবরা বক্তৃতা আমাদের চিত্তে আজো আন্দোলিত। রাষ্ট্র ব্যবস্থা সম্পর্কে বলতে গিয়ে তিনি গোটা ব্রিটিশ পার্লামেন্টকে প্রকম্পিত করেছিলেন। একটি রাষ্ট্রের সব ধরনের উপাদানের যুক্তিনির্ভর ব্যাখ্যা তিনি দিয়েছিলেন। স্যার এডমন্ড বার্কই প্রথম উচ্চারণ করেছিলেন চতুর্থ রাষ্ট্রের কথা। সংবাদ মাধ্যমকে তিনি যথার্থভাবেই 'Fourth State' বলে অহঙ্কার অনুভব করেছিলেন। আজ একবিংশ শতকে এসে স্যার এডমন্ড বার্কের কথার সত্যতা আরো প্রকট হয়ে আরো জীবন্ত হয়ে নিয়ত প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে আমাদের রাষ্ট্র ও সমাজ জীবনে। রাষ্ট্র কোনো একক ব্যবস্থার অধীনে কোনো ভূখণ্ড নয়। রাষ্ট্রের অনেকগুলো উপাদান রয়েছে। এর মধ্যে সরকার কেবল একটি উপাদান। এছাড়াও রাষ্ট্রের রয়েছে বিচার বিভাগ, আইন বিভাগ, সুশীল সমাজ এবং সর্বোপরি এর সর্বশক্তিমান জনগণ। একটি রাষ্ট্রকে ব্যর্থ বলা যেতে পারে যখন এর সব উপাদান চরম ব্যর্থতার পরিচয় দেয়। আমাদের বেলায় কি তেমনটি ঘটেছে? শত নিয়ন্ত্রণ থাকা সত্ত্বেও আমাদের বিচার বিভাগ প্রায়ই ঐতিহাসিক রায় দেন, যা শুধু দেশেই নয় গোটা বিশ্বের সভ্য সমাজকে তাক লাগিয়ে দেয়। আমাদের জীবনের অনেক ঘোর অমানিশার অবসান হয়ে সুবহিসাদেকের রক্তিম সূর্যোদয় ঘটেছে এমন অনেক ঐতিহাসিক রায়ের মাধ্যমে। অতএব আমাদের বিচার বিভাগকে ব্যর্থ বলে এক ফুৎকারে উড়িয়ে দেয়ার অবকাশ নেই। বেশ শক্তিশালী, সাহসী ও কার্যকর একটি বিচার বিভাগ আমাদের দেশে রয়েছে। বিশেষ করে উচ্চ আদালত। আমাদের দেশে একটি সুশীল সমাজ রয়েছে। যে কোনো অন্যায়-অবিচারের বিরুদ্ধে আমাদের দেশের সুশীলসমাজ খুবই সোচ্চার। তাদের

ব্যর্থতার দায়ভার বহন করতে হয় তবে তা অবশ্যই করতে হবে সরকার ও প্রশাসনকে, অবশ্য দেশ কিংবা জনগণকে নয়। অতএব ব্যর্থতার গ্লানি যদি কারো ললাটে চাপাতে হয় বা করো শিরে ব্যর্থতার পাগড়ি পরিয়ে দিতে হয় অথবা কারো গলায় বিনাসূতোয় গাঁথায় ব্যর্থতার মালা পরিয়ে দিতে হয় তবে তা দিতে হবে সরকারকে। এ অনাকাঙ্ক্ষিত কলংকের ভাগিদার আমাদের প্রিয় মাতৃভূমি কিংবা এর জনগণ হতে যাবে কেন? তবে কথা থেকেই যায়, ফুরোয় না। একটি কথা আছে- কান টানলে মাথা আসে। আমাদের সরকার কেবলই ব্যর্থ হয়। কেবলই দুর্নীতি ও অপশাসনে বিশ্ব শিরোপা অক্ষুণ্ণ রাখতে থাকে বৈষম্য ও বিভেদ সৃষ্টি করে জাতীয় জীবনকে পঙ্গু করে দেয়, জাতিকে নিয়ত বিপথে পরিচালিত করে, বিভ্রান্তির চোরাবালিতে ডুবিয়ে দিয়ে জাতিকে অপমৃত্যু ও আত্মহননের পথে ঠেলে দেয় কিংবা জাতির যা কিছু গর্বের, যা কিছু ঐতিহ্যের সবকিছুকে ছলচাতুরি বা আত্মপ্রতারণার গিলাব দিয়ে আষ্টেপৃষ্ঠে ঢেকে দেয় তখন যে পর্বতপ্রমাণ ব্যর্থতার পাহাড় জমে ওঠে তাতে দেশ ও সরকার একাকার হয়ে যায়। এমন ক্ষেত্রে সরকার ও রাষ্ট্র একাত্মবোধক হয়ে ওঠে। তখন সরকার ব্যর্থ না রাষ্ট্র ব্যর্থ এমন সীমারেখা টানা দুরূহ-দুষ্কর হয়ে ওঠে। অতএব রাষ্ট্রকে ব্যর্থতার কলংক থেকে বাঁচাতে হলে সরকারকেও দুর্নীতি, অপশাসন, ব্যর্থতার রাহুত্ব থেকে মুক্ত করে আনতে হবে। আমাদের দেশ ব্যর্থ নয়- এ অহঙ্কার করতে হলে অবশ্যই সরকারকেও একটি সীমারেখা পর্যন্ত সফল হতে হবে। হতে হবে দুর্নীতিমুক্ত ও সুশাসন প্রতিষ্ঠায় মনোযোগী। তা না হলে রাষ্ট্র ব্যর্থ নয়, সরকার ব্যর্থ এমন কথা কেবল অর্থহীন বাগাড়ম্বর বলে বিবেচিত হবে। কলঙ্কের কালিমা থেকে রাষ্ট্র কিংবা জাতিকে মুক্ত করা সম্ভব হবে না।

ঝিরিনোভস্কির রাজনৈতিক তস্করবৃত্তি

সব রকমের শিষ্টাচার ও সভ্যতা-ভব্যতা আর একবার মুখখুবড়ে পড়ল ভারতের রাজধানী নয়াদিল্লিতে। এ অঞ্চলের কোটি কোটি স্বাধীনতাপ্রিয় মানুষের অনুভূতির রাজ্যে হঠাৎ এক পাগলা মোষ ঢুকে পড়ে সবকিছু লগুভগু করে দিল। এই অঘটন ও অপকর্মের হোতা কট্টর রুশ নেতা ভ্লাদিমির ঝিরিনোভস্কি। সম্প্রতি ভারত সফর করতে এসে এই ভদ্রলোক গোটা অঞ্চলকে উত্তপ্ত করে গেলেন। হিটলারের প্রেতাত্মা উগ্র বর্ণবাদী ঝিরিনোভস্কি তার মনের খায়েশ ব্যক্ত করতে গিয়ে আহত করলেন অগণিত দেশপ্রেমিক মানুষকে, ছড়িয়ে দিলেন গোটা অঞ্চলে ঘৃণা আর ক্ষোভের দাবানল।

দিল্লিতে এসে ‘দিল্লিকা লাড্ডু’ খেতে খেতে তিনি ভারতকে নসিহত করলেন বাংলাদেশ ও পাকিস্তানকে কার্যকরভাবে দখল করে নিতে। ঝিরিনোভস্কির শিষ্টাচার ও বিবেকবর্জিত এহেন উক্তি বে-ফাঁসভাবে বেরিয়ে যাওয়া কোন তুচ্ছ মন্তব্য নয়। পরবর্তী ঘটনাপ্রবাহ ও কথায়-কাজে তিনি প্রমাণ করেছেন, এটা তার সুচিন্তিত অভিমত। রাজনৈতিক দর্শন। ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা। ১৯৪৬ সালে বাল্টিক সাগরতীরে জনগ্ৰহণকারী রাশিয়ার এই তথাকথিত ‘মহামানব’ অবিভক্ত ভারতবর্ষের মানচিত্র দেখে নাকি প্রীত হয়েছিলেন। জন্মের সাথে সাথেই তার মা-মাসিরা যখন ঝিরিনোভস্কির মুখে মধু ঢেলে দিচ্ছিলেন তখন সেই সদ্যজাত শিশুটি অখণ্ড ভারতের ইতিহাস-ঐতিহ্যের প্রতি গভীরভাবে আকৃষ্ট হয়েছিলেন। অতএব আজ পরিণত বয়সে যখন তিনি মহাপ্রয়াণের আলামত দেখছেন তখনই তার সুপ্ত মনে লালিত বাসনা জেগে উঠল মৃত্যুর পূর্বে আবার অখণ্ড ভারত দেখে যাওয়ার।

একবিংশ শতকের স্বপ্নভেজা বিশ্বকে সামনে রেখে গোটা মানব জাতি যখন শান্তির ললিত বাণীর সন্ধানে নিরন্তর ব্যাপ্ত যুদ্ধ হানাহানি, রক্তলিপ্সা, বিদ্রোহ, ঘৃণা, মারণাস্ত্র সব কিছুকে দাফন করে মানুষ যখন মানবতার ঝাণ্ডা হাতে নিয়ে নতুন শতকের নতুন বিশ্বকে বরণ করার প্রত্যয় উনুখ তখন বিশ্বের অন্যতম জনপদ রুশ প্রজাতন্ত্রের বিরোধীদলীয়

মুহূর্তে তৎকালীন সোভিয়েত নেতৃত্ব ও জনগণ আমাদের পাশে ছিল। কেবলমাত্র বাংলাদেশের স্বাধীনতাকে নিশ্চিত করার লক্ষ্যে কমপক্ষে চারবার সোভিয়েত রাশিয়া আমাদের পক্ষে জাতিসংঘে ভেটো প্রয়োগ করেছিল। আর আজ সেই দেশের এক নেতা ত্রিশ লাখ লোকের রক্তভেজা আমাদের স্বাধীনতা "Artificial Entity" বলে কটাক্ষ করতে বিন্দুমাত্র বিচলিত হননি। আমাদের কাছে না দিলেও রুশ প্রজাতন্ত্রের জনগণের কাছে এর কৈফিয়ত দিতে হবে ঝিরিনোভস্কিকে।

ঝিরিনোভস্কি কী বলেছেন তা নিয়ে ভারতের মাথাব্যথার কারণ নেই। তিনি ভারতে অতিথি হিসাবে বেড়াতে এসেছেন। তার মুখে কুলুপ লাগানোর দায়িত্ব ভারতের নয়। তবে এই ব্যক্তিটি যা কিছু বলেছেন সবই ভারতের মাটিতে দাঁড়িয়ে। ভারত বাংলাদেশের প্রতিবেশী বন্ধু রাষ্ট্র। বিশেষ করে বাংলাদেশের স্বাধীনতায়ুদ্ধের সাথে ভারতের এক গভীর আবেগময় সম্পৃক্ততা রয়েছে। তাই আমাদের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব নিয়ে যদি কেউ তামাশা করতে চায়, যদি কেউ কটাক্ষ করতে চায়, তাও আবার ভারতের মাটিতে বসে তবে ভারত ও তার জনগণ একে সহজভাবে নিতে পারে না। ঝিরিনোভস্কির বক্তব্য তার নিজস্ব। এর পুরো দায়দায়িত্ব তারই। তবুও ভারতকে অবশ্যই বলতে হবে, এর সাথে তার কোন সংস্রব নেই। এ জাতীয় কটুক্তি ভারতের কাছে অনাকাঙ্ক্ষিত। ঝিরিনোভস্কির বক্তব্যে ভারত ক্ষুব্ধ এবং ভারতকে আরও নিশ্চিত করতে হবে ভবিষ্যতে আর কেউ তার পবিত্র মাটিতে পা রেখে এ ধরনের বলাহীন ও ঔদ্ধত্যপূর্ণ উক্তি বন্ধু রাষ্ট্রের প্রতি করতে পারবে না। ভারতকে সম্প্রসারণবাদী হবার পরামর্শ দিয়ে আসলে ঝিরিনোভস্কি ভারতকে ছোট করতে চাইছেন। বিশৃঙ্খলার দিকে ঠেলে দিতে চাইছেন। ভারতের অভ্যন্তরে একশ্রেণীর উগ্র জনগোষ্ঠী ঝিরিনোভস্কির বক্তব্যকে স্বাগত জানিয়ে নাচানাচি শুরু করে এই সত্যটাকেই প্রতিষ্ঠিত করতে উদ্যত হয়েছে।

নো জাজমেন্টস অ্যাকসেস্টেবল, নো জাজেস সেফ

নজিরবিহীন ঘটনা ঘটে গেল সুপ্রিম কোর্টে। দেশের সর্বোচ্চ বিচারালয়ে সংঘটিত ঘটনাটি দুঃখজনক, নিন্দনীয় ও অপ্রত্যাশিত। প্রধান উপদেষ্টার বৈধতা চ্যালেঞ্জের রিটকে কেন্দ্র করে এই অভাবনীয় ঘটনা ঘটে গেল। কোন কিছুই বাদ যায় নাই। সংঘর্ষ, ধাওয়া, পাল্টা-ধাওয়া, ভাংচুর এমনকি অগ্নি সংযোগ পর্যন্ত।

আওয়ামী লীগ নেতৃত্বাধীন ১৪ দল ও সমমনা কয়েকটি রাজনৈতিক দলের পক্ষ থেকে হাইকোর্টে এই রিট পিটিশন দায়ের করা হয়েছিল। বিচারপতি আওলাদ আলী ও বিচারপতি মাস্টনুল ইসলাম চৌধুরী সমন্বয়ে ঘটিত বেঞ্চে এই রিটের শুনানি হয়েছে। একই সাথে অন্য দুইটি রিট পিটিশনও একই বেঞ্চে শুনানি হয়।

মোট তিন দিন বিভিন্ন পর্যায়ে আইনি প্রক্রিয়া ও শুনানি শেষে বৃহস্পতিবার এই রিট মামলার রায় প্রদানের দিন ধার্য করা হয়। সকালের উভয় পক্ষের বক্তব্য ও যুক্তিতর্ক শোনার শেষে হাইকোর্ট বেঞ্চের মাননীয় বিচারকদ্বয় দুপুর দুটায় আদেশ দেবেন বলে ঘোষণা দেন। তখন কিন্তু রিট আন্দোলনের পক্ষে আইনজীবীগণ বিশেষ করে ডক্টর কামাল হোসেন, ব্যারিস্টার আমির-উল-ইসলাম ও ব্যারিস্টার রোকন উদ্দিন মাহমুদ সকালের সেসনেই আদেশ ঘোষণার জন্য পীড়াপীড়ি করেন। কারণ তারা ইতোমধ্যেই কোর্ট প্রাঙ্গণে কিছু ষড়যন্ত্রের নমুনা দেখতে পান। কিন্তু বেঞ্চের বিচারকদ্বয়ের অভয়বাণীতে তারা আশ্বস্ত হন।

ঠিক দুপুর দুটা বাজলে যথারীতি কোর্ট বসেন। বিচারকদ্বয় রিট মামলার আদেশ প্রদানে উদ্যত হন। ঠিক এই সময় এটর্নি জেনারেল তার পকেট থেকে একটি কাগজ বের করে বিচারকদের কাছে হস্তান্তর করেন। কানায় কানায় পূর্ণ কোর্ট রুমের সকলেই হতচকিত হয়ে যান। এক উদ্বেগজনক পরিস্থিতি কোর্ট রুমে বিরাজ করে। তারপর শঙ্কাই সত্যে পরিণত হলো। বিচারকগণ জানালেন মহামান্য প্রধান বিচারপতি সৈয়দ জে. আর. মোদাচ্ছির, 'এই দরখাস্তটির আর শুনানি হবে না' বলে আদেশ দিয়েছেন। শুধু তাই নয়

আবেগ আপ্ত কণ্ঠে শান্ত হওয়ার উদাত্ত আহ্বান জানাতে হয়েছিল। ঐ টিভি ভাষণে কেনেডি বলেছিলেন, 'Observance of the Law is the eternal safeguard of liberty and defence of the law is the surest road to tyranny.' আদালত ও আইনের শাসনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়ার আকুল আবেদন রেখে জনপ্রিয় প্রেসিডেন্ট দেশবাসীকে সতর্ক করে বলেছিলেন, "If this country should ever reach the point where any man or group of man by force or threat of force could long defy the commands of the court then no laws would stand free from doubts, no judges would be sure of his writ and no citizen would be safe from his neighbours. আইন আদালততো মানুষের জন্যই। মানুষের ভালমন্দ দেখাশুনার জন্য আইনের মঙ্গলের জন্য কিংবা আদালতের সম্মান রক্ষার জন্য মানুষ নয়। আমাদের দেশের পবিত্র সংবিধানেও এই পরম সত্যটি স্বীকৃত। জনগণ সার্বভৌম। জনগণই সকল ক্ষমতার মালিক। আইন প্রণয়ন হোক কিংবা বিচার ব্যবস্থা হোক এর অন্তর্নিহিত মূল সুরটি হলো জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন ঘটানো।

আবার কেনেডির কথায় চলে আসি। তিনি বলেছিলেন, For the most effective means of upholding the law is not the state police man or the marshals nor the national guard. It is you, The People. It lies in your courage to accept those laws with which you disagree as well as those which you agree. এখানে আইন ও বিচারের সাথে জনগণের সম্পৃক্ততার কথা বলা হয়েছে। জনগণের আস্থা ও বিশ্বাসের উপর জোড় দেওয়া হয়েছে। একথা অবশ্যই স্বীকার করতে হবে যে, আইন আদালতের উপর জনগণের আস্থা থাকবে না। তেমন আইন আদালতে টিকতে পারে না। এই ধ্রুব সত্যটি অন্তত বাংলাদেশের মানুষের আইনের বই পড়ে শিখতে হবে না। ইতিহাস থেকেই শিক্ষণীয়। পাকিস্তানীরা বঙ্গবন্ধুর বিরুদ্ধে দায়ের করেছিল আগড়তলা ষড়যন্ত্র মামলা। আদালত বসেছিল আব্দুল গণি রোডস্থ চামেলী হাউসে। জনগণ সেই ভবনটি পুড়িয়ে ছারখার করে দেয়। সেই মামলার পাকিস্তানী বিচারক এস. রহমান দৌড়ে পালিয়ে জীবন বাঁচিয়েছিল। এভাবেই যুগ যুগ ধরে ইতিহাসের বাঁকে বাঁকে এসে জনগণের আদালতই সর্বোচ্চ আদালত হিসাবে প্রমাণিত হয়েছে। জনগণের রায়ই সর্বোচ্চ রায়। অন্যদিকে Any judgement which is not consistant to the hopes and aspiration of the people is not acceptable and the judge himself is not safe. কোন রায় ঘোষণার কিংবা নির্দেশ প্রদানের পূর্বে সংশ্লিষ্ট বিচারপতি এই অমোঘ সত্যটি মনে রাখা দরকার। প্রধান বিচারপতি সৈয়দ জে.আর. মোদাচ্ছিরের বেলাও একই কথা প্রযোজ্য।

বিএনপি-জামায়াত জোট : তোমাকে বধিবে যে গোকুলে বেড়েছে সে

তেলে আর জলে মেশে না। এটা প্রকৃতির স্বতঃসিদ্ধ নিয়ম। তবুও অনেক সময় তেলে-জলে মেশানো হয়। কিন্তু ফল হয় উল্টো। ক্ষেত্রবিশেষে ঘটে চরম বিপর্যয়। আজ বাংলাদেশের রাজনীতিতে ঠিক তেমনি বিপর্যয়কর ঘটনার জন্ম হয়েছে। প্রকৃতির আরো একটি স্বতঃসিদ্ধ ধর্ম রয়েছে। তাহলো রোগ সংক্রামক স্বাস্থ্য সংক্রামক নহে। এক হাজারটা স্বাস্থ্যবান লোকের মধ্যে একজন রোগীকে এনে দাঁড় করালে সে কখনো সুস্থ হয়ে উঠতে পারবে না। কিন্তু একজন ছোঁয়াছে রোগীর কাছে এক হাজার লোক ছাড়া হলে প্রত্যেকেই সংক্রমিত হওয়ার আশঙ্কা থাকে। একাত্তরের ঘাতক, খুনি চক্রের সঙ্গে সখ্য করতে গিয়ে এই নর্মম সত্যটি আজ হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছে ‘মুক্তিযোদ্ধা’ জিয়াউর রহমান প্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বিএনপি।

এখানে চরম সত্য কথাটা বলে রাখা ভালো। বিএনপির সঙ্গে জামায়াতের সখ্যটা কেবল ২০০১ সালে নির্বাচনকে কেন্দ্র করেই গড়ে ওঠেনি। জিয়াউর রহমান সাহেব জামায়াতের প্রধান গোলাম আজমকে (যার নাগরিকত্ব বাতিল করা হয়েছিল হানাদারদের সহায়তা করার অপরাধে) বিদেশ থেকে অমন্ত্রণ করে বাংলাদেশে এনে রাজনীতিতে পুনর্বাসিত করেছিলেন। তিনি এক অজানা কারণে হঠাৎ ভুলে গিয়েছিলেন বীর মুক্তিযোদ্ধা আর পরাজিত রাজাকার-আলবদররা একত্রে ওঠাবসা করতে পারে না। কিন্তু স্বার্থ বড় নিষ্ঠুর ও ক্ষমাহীন। কেবল পঁচাত্তর পরবর্তী দেশের ক্ষমতা কুক্ষিগত ও ক্ষমতা টিকিয়ে রাখার গরজেই এই অদ্ভুত ও আত্মঘাতী সহমর্মিতার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করা হয়েছিল। এমনভাবে ক্ষমতা দখল ও ভোগবিলাসের যে লিস্সা সেদিন বাংলাদেশের রাজনীতিতে নাজিল হয়েছিল তারই এক সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ফোকড় দিয়ে যুদ্ধাপরাধী জামায়াত চক্র ‘মুক্তিযোদ্ধা’ জিয়াউর রহমানের সাফারির ভাঁজে আশ্রয় নিয়েছিল। আরব দেশে নাকি তাঁবু দেখলে উট এসে তার নাকটি তাঁবুর মধ্যে ঢুকিয়ে

বিএনপিতে যারা মধ্যপন্থী বলে পরিচিত তারাও যে বর্তমান ভয়াবহ পরিস্থিতি সম্পর্কে ওয়াকিবহাল নন তা নয়। কত দুঃখ ও বেদনায় পড়ে বিএনপির মহাসচিব আবদুল মান্নান ভূঁইয়া সাহেব টিভি চ্যানেলের সামনে বলতে বাধ্য হন যে, দেশ আজ বিপন্ন, গণতন্ত্র বিপন্ন, এমনকি সংবিধান ও বিপন্ন। ভূঁইয়া সাহেব ভালো করেই জানেন, তারা সরকার গঠন করেছেন যে শপথ বাক্য পাঠ করেন তাতে প্রথমেই বলা হয়েছে সংবিধান সংরক্ষণ করার কথা। আজ যখন প্রকাশ্যেই বলেছেন সংবিধান বিপন্ন, তখন কি তারা ক্ষমতায় থাকার নৈতিক অধিকার রাখেন? তারপরেও পরিস্থিতি এত ভয়াবহ যে, সত্য কথাটি মুখ ফসকে উচ্চারিত হয়ে যায়। মান্নান ভূঁইয়া-নোমান ভাইদের এই দুরবস্থা দেখে কেবলই মরমী লোক সঙ্গীতের কথা মনে হয়— ‘ভাবিলে আর কী হবে গো, যা হবার তা হইয়া গেছে’।

রাজনীতিতে শেষ বলে কোনো কথা নেই। বিএনপির সামনে রাস্তা পরিষ্কার। জামায়াত চক্র এমন একটি অংকের হিসাব দাঁড় করিয়েছে যে, তারা সরে গেলে বিএনপি নির্বাচনে একেবারেই ধরাশায়ী হয়ে যাবে। আসলে এই অংক অনেক আগেই বাংলাদেশের রাজনীতিতে এলোমেলো হয়ে গেছে, ভুল প্রমাণিত হয়ে গেছে। চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে জামায়াতের লাখ খানেক ভোট গেল কোথায়? দিনাজপুরের উপনির্বাচনে জামায়াত ধরাশায়ী হলো কেন? পটিয়ার নির্বাচনে জামায়াতের ভরাডুবির কারণ কি? রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা আজ বিএনপির মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় লালিত ও প্রগতিশীল নেতা-কর্মীদের সঙ্গে এক মত যে, বিএনপির জন্য বর্তমান জামায়াত একটি মস্ত বড় পলিটিক্যাল লায়াবিলিটি। যত তাড়াতাড়ি জামায়াতি ভৃত্যকে ঘর থেকে নামানো যাবে বিএনপির জন্য ততই মঙ্গল। বিএনপিকে আজ গভীরভাবে বুঝতে হবে— ‘তোমারে বধিবে যে গোকুলে বেড়েছে সে’ যে বিষধর কাল সাপ তারা দুধ-কলা দিয়ে এতদিন পোষণ করেছে, তোষণ করেছে আজ সে উদ্ধত ফণা বিস্তার করে দাঁড়িয়েছে ছোবল দেওয়ার জন্য। একেবারে বিএনপির হৃদপিণ্ডের ঠিক কেন্দ্রবিন্দুতে, কইলজার মধ্যে।

রাজাকারের ঔদ্ধত্য পদভরে কম্পিত বাংলাদেশে এবার বৈশাখ এসেছে বাঙালিদের অভ্যভেদী দাপট নিয়ে

এবার বাংলা নববর্ষের সূর্য উঠেছে অন্যভাবে। ১৪১৩ সালের আবির্ভাব ঘটেছে আমাদের জাতীয় জীবনে একেবারেই ভিন্নরূপে। রাতের আঁধার মুছে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই পহেলা বৈশাখে গোটা দেশ ভেসেছিল প্রাণের জোয়ারে। দুর্জয় প্রাণের আনন্দে মাতোয়ারা হয়ে ছেলে-বুড়ো, নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকল বাঙালি ঘর ছেড়ে বাইরে এসে নির্মল আনন্দ সাগরে ভেসে বেড়িয়েছে। রাজধানী ঢাকার পুরোটাই পরিণত হয়েছে মিছিলের নগরীতে। অস্তিত্বের টানে আর শেকড়ের সন্ধানে বেরিয়ে পড়েছে লাখে জনতা। অন্তহীন মিছিল মিছিলে সয়লাব হয়ে গেছে গোটা শহর। একই দৃশ্য ছিল এবার বিশাল বাংলাজুড়ে। হাটখোলা-বটতলা সর্বত্রই আনন্দমুখর বীর বাঙালির দীপ্ত পদচারণায় বাঙময় হয়েছে, মুখরিত হয়েছে। এবারের জনতার উচ্ছ্বাস-আবেগ ও উন্মাদনা ছিল অভূতপূর্ব। পহেলা বৈশাখ ইতিপূর্বে নির্দিষ্ট একটি শিক্ষিত মধ্যবিত্তের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। এবারের নববর্ষের চেতনা উজ্জীবিত করতে পেরেছে বাঙালিদের। সাধারণ, মধ্যবিত্ত ও উচ্চবিত্ত সকল বাঙালিই পহেলা বৈশাখের চেতনায় উদ্দীপ্ত হয়েছে। অবশ্য এর কারণও ছিল অত্যন্ত সুস্পষ্ট।

আমাদের প্রিয় চারণ কবি মুকুন্দ দাসের একটি অতি জনপ্রিয় মরমি গানের অন্তরাটি এখানে মনে পড়ে। ‘মাগো, আমরা তোমার শান্তি প্রিয় শান্ত ছেলে/তবু শত্রু এলে অস্ত্র হাতে লড়তে জানি/তোমার ভয় নেই মা আমরা প্রতিবাদ করতে জানি।’ এই চরণ উচ্চারিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই বাঙালি মাত্রই মন্ত্রমুগ্ধের মতো একাকার হয়ে যায়। চেতনায়-প্রেরণায় আঙ্গিকে-অবয়বে প্রতিটি বাঙালি উজ্জীবিত হয়ে ওঠে বাঙালিদের প্রচণ্ড দাপটে। মুকুন্দ দাসের গানের যে মূল সুরটি অনুরণিত হয়েছে, ঝংকৃত হয়েছে তার গানের প্রতিটি শব্দে, ছন্দে, ব্যঞ্জনায়-দ্যোতনায় তা হলো আমাদের শাস্বত প্রতিবাদী চরিত্র। আঘাত না আসলে আমরা প্রত্যাঘাত করতে পারি না। প্রত্যয়ী ও প্রতিবাদী হতে পারি না। আমাদের জাতির সামনে শত্রু এসে দাঁড়ালেই আমরা বজ্রের মতো গর্জন করে উঠি। আমাদের ইতিহাস-ঐতিহ্য, ভাষা-সংস্কৃতির প্রতি সামান্য আঘাত আসলেই আমরা ক্রুদ্ধ নাগিনীর মতো, মণ্ডমাতঙ্গের মতো, হুদশাবা বাঘিনীর মতো গর্জন করে উঠতে পারি। এটাই আমাদের ইতিহাসের শিক্ষা। এটাই আমাদের ঐতিহ্যের অহঙ্কার। এই

অহংবোধের জন্য আমরা পৃথিবীর বুকে একমাত্র জাতি হিসেবে অত্যাঙ্কুল সম্মানের সিংহাসনে অভিষিক্ত হয়ে আছি। আমরাই সে বীরের জাতি যে জাতি মায়ের ভাষার সম্মান ও মর্যাদা রক্ষা করতে গিয়ে অকাতরে প্রাণ দিতে পেরেছে। ঘাতকের বুলেটের আঘাতে বুক ছিন্ন-ভিন্ন হয়ে গেছে কিন্তু এতোটুকু মাথা নত হয়নি। আমাদের এই গৌরব গাঁথারই স্বীকৃতিস্বরূপ মহান একুশে ফেব্রুয়ারি বিশ্বজুড়ে পালিত হচ্ছে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে। এই দিনে অন্তত বিশ্বের ১৮০টি দেশের মানুষ স্মরণ করছে আমাদের বাংলার সন্তানদের- যারা মায়ের ভাষাকে রক্ষা করতে গিয়ে মরে অমর হয়ে রয়েছে ইতিহাসের পাতায়।

পঞ্চাশের রক্তঝরা দশক পেরিয়ে আমরা যখন ঘাটের দশক অতিক্রম করছিলাম তখনো আবার ভিন্ন কায়দায় আমাদের বাংলা ভাষা ও লালিত্য সংস্কৃতির ওপর আঘাত এসেছিল। তথাকথিত পাকিস্তানী তাহজিব-তমুদ্দুনের নামে বাংলার আবহমান সংস্কৃতির প্রাণস্পন্দন স্তব্ধ করে দেয়ার সুকৌশল চক্রান্ত করেছিল পাকিস্তানী শাসক-শোষক ও তাদের পদলেহী এ দেশীয় কুলাঙ্গাররা। রবীন্দ্র সঙ্গীতের বিরোধিতার নামে তথা আপামর বাঙালিদের রবীন্দ্রিক বলয় থেকে টেনেহিঁচড়ে বের করে ক্রোদাক্ত পাকিস্তানী উর্দু কালচারের গোলাম বানানোর এক দোঁদগু প্রকৃতি চলছিল ঘাটের দশকের মাঝামাঝি সময়ে। শৈরাচারী আইয়ুবের কুলাঙ্গার পুত্র বলে খ্যাত গভর্নর মুনায়েম খান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বরণ্য শিক্ষাবিদ, ভাষাতাত্ত্বিক ও গবেষকদের ডেকে নিয়ে ভর্ৎসনা করে বলেছিলেন- কেন তারা নিজেরাই রবীন্দ্রসঙ্গীত লিখতে পারেন না। বাংলা সাহিত্যের প্রবাদ পুরুষ ও প্রগতিশীল চিন্তাচেতনা ও বুদ্ধিবৃত্তির অর্থসৈনিক অধ্যাপক আব্দুল হাই মুনায়েম খানের মুখের ওপর বলেছিলেন, আমরা যদি সংগীত লিখি তা হবে হাই সংগীত, রবীন্দ্র সংগীত নয়।

প্রকারান্তরে মুনায়েম খানদের ধন্যবাদ। আমাদের ভাষা, কৃষ্টি ও সংস্কৃতির ওপর আঘাত করেছিল বলেই সেদিন বাঙালিরা প্রতিবাদী হয়ে উঠতে পেরেছিল। ঐক্যবদ্ধভাবে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পেরেছিল। সেদিনের সেই ঐক্যচেতনা শেষ পর্যন্ত আমাদের স্বাধিকার তথা স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রধান প্রেরণা হয়ে বাঙালিদের এক দুরন্ত সাহসী, অপ্রতিরোধ্য ও লড়াকু জাতিতে পরিণত করেছিল এবং এই প্রতিরোধের আগুনে দন্ধ পোড়খাওয়া জাতিকে সঙ্গে নিয়েই শেষ পর্যন্ত জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান পৃথিবীর মানচিত্রে বাংলাদেশ নামক একটি গৌরবদীপ্ত স্বাধীন, সার্বভৌম রাষ্ট্রের জন্ম দিয়েছিলেন।

এবারের বাংলা নববর্ষ তেমনি একটি প্রতিবাদী রূপ নিয়ে আবির্ভূত হয়েছে। যে ঘৃণিত বাঙালিবিরোধী চক্র একদিন সালাম-বরকত-রফিক-জব্বারদের গুলি করে হত্যা করেছিল, রবীন্দ্রসঙ্গীত বন্ধের পাঁয়তারা করেছিল, আমাদের শহীদ মিনার কামানের গোলায় গুঁড়িয়ে দিয়েছিল, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আয়েশি বটগাছটিকে উপড়ে ফেলেছিল, জয় বাংলা স্লোগান দেয়ার অপরাধে পাঁচ বছরের দুঃখপোষ্য শিশুর মাথার খুলি সঙ্গীন দিয়ে খুঁচিয়ে বাংলাদেশের পতাকা পুঁতে দিয়েছিল, যারা উঠানে শুকানো মায়ের শাড়ির

আঁচল আর পিতার জায়নামাজের উদার জমিন অপবিত্র করেছিল সেই ঘৃণিত শকুন ও তাদের প্রেতাত্মারা আজ রাষ্ট্রক্ষমতার ভাগীদার। সেই ঘৃণ্যচক্র আবাবো বাঙালিদের সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের মূলে হিংস্র ছোবল দিতে উদ্যত। ঠিক এমন এক মুহূর্তে বাংলা নববর্ষ ১৪১৩ আমাদের জাতীয় জীবনে সমাগত। এ কারণেই এবারের পহেলা বৈশাখের এই রুদ্রমূর্তি-প্রতিবাদী ঝড়ো হাওয়া। উগ্র মৌলবাদ, জঙ্গি ও সাম্প্রদায়িক শক্তির নখরাঘাতে ছিন্ন-ভিন্ন জাতীয় জীবনে এবারের বৈশাখী আগমন তাই চম্ভালিকার মূর্তিতে। জাতীয় জীবনের এক ভয়ঙ্কর দুর্যোগ অত্যাশন্ন প্রত্যক্ষ করেই বাঙালিরাই তাদের উগ্রমূর্তি নিয়ে প্রতিবাদী চেতনায় ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছে মঙ্গল শোভাযাত্রায়। তাদের কণ্ঠে ছিল অপশক্তি রোখার সুদীপ্ত শপথ আর পদভারে ছিল প্রকম্পিত মেদিনী। জাতীয় জীবনের এই আসন্ন ঝড়ো হাওয়ার সংকেত কিংবা এই দুর্যোগ সন্ধিক্ষণে আমাদের কর্তব্য সম্পর্কে কেউ কাউকেই সজাগ করে দিতে হয়নি। বাঙালি মানুষের এটাই সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ, অন্তর্নিহিত শক্তি। তারা নিজেরাই উপলব্ধি করে নিয়েছে আসন্ন ঝড়ো হাওয়ার ইঙ্গিত এবং একই সঙ্গে স্থির করে নিয়েছে তাদের অগ্নিশপথের দীক্ষা।

অপরদিকে বাঙালি-বিরোধিরাও অসচেতন ছিল না, অন্ধকারে নিমজ্জিত ছিল না। তারাও টের পেয়েছিল বাঙালি মানসের এই সহজাত একাত্মবোধ হওয়ার ঘটনাটি। তাই কেবল আত্মরক্ষা নয়, পরিস্থিতি সামাল দিয়ে কীভাবে তাদের কুটিল স্বার্থ হাসিল করা যায় সে সম্পর্কে তাদের প্রস্তুতিও ছিল লক্ষণীয়। হঠাৎ করেই দেখা গেলো ইসলামপন্থীরা তাদের আদলে বাংলা নববর্ষ উদযাপনের তোড়জোড় শুরু করলো। হামদ-নাতে মাধ্যমে তারা বরণ করে নিতে চাইল পয়েলা বৈশাখকে। এটা কোনো নতুন চালবাজি নয় কিংবা নতুন কোনো কৌশলও নয়। একেবারেই ‘নতুন বোতলে পুরোনো মদ’। তাদের পিতা, প্রপিতারা এমনি করেই বাঙালি সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য দখল ও বিনষ্ট করার তৎপরতা চালিয়েছিল ষাটের দশকের উত্তাল দিনগুলোতে। তারাও পাকিস্তানের তাহজিব-তমুদ্দুন ও তথাকথিত জাতীয় ঐক্য সংহতি রক্ষার খায়েস নিয়ে গঠন করেছিল ব্যুরো অব ন্যাশনাল রি-কনস্ট্রাকশন। কিন্তু বাঙালিদের প্রবল স্রোতে তারা ভেসে গেছে নিক্ষিপ্ত হয়েছে ইতিহাসের আঁস্জাকুড়ে। আজো যারা ধর্মীয় উন্মাদনা মধ্য দিয়ে বাঙালির চিরায়ত কৃষ্টি-সভ্যতা, ইতিহাস-ঐতিহ্য দখলের পায়তারা করছে তাদের বুঝতে হবে বাঙালিত্ব এক বিশাল শক্তির আধার। কোনো প্রকার ষড়যন্ত্র করে নয়, বাঙালিদের বিশাল সমুদ্রে অবগাহন করতে হলে চাই মনেপ্রাণে বাঙালি হওয়া। ষড়যন্ত্র করে, ‘পায়েন্দাবাদের’ ভূত নামিয়ে উদাস কণ্ঠে উচ্চারিত হতে হবে ‘আমার সোনার বাংলা- আমি তোমায় ভালোবাসি।’ এই ভালোবাসার মধ্যে যাদের সামান্যতম খাদ থাকবে তারাই ছিটকে পড়বে বাঙালি মানসপট থেকে। ষড়যন্ত্র করে, পায়েন্দাবাদের বোরকা পরে বাঙালি হওয়া যাবে না, কিংবা বাঙালি হৃদয় দখল করে কারো কোনো খায়েস পূরণ করা যাবে না। বাংলাদেশে যারা রাজনীতি করতে চান, ক্ষমতা দখল করতে চান তাদের উচিত হবে অতীতকে ভুলে, অতীতের অপকর্মের জন্য নিঃশর্ত ক্ষমা চেয়ে মনে প্রাণে বাঙালি হয়ে যাওয়া।